মহাকালী

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা



প্রথম সংস্করণ—চৈত্র, ১৩৫৩
প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
মুদ্রাকর—শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা
প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—
[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স।

তিন টাকা আট আনা

ডক্টর বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)
সুহৃদ্বরেষু—

এই লেখকের :

বন্ধনী
আকাশ ও মৃত্তিকা
শৃঙ্খল
পান্থনিবাস
মধুচক্র
ঘরের ঠিকানা
বসন্ত রজনী
মনের গহনে
শতাব্দীর অভিশাপ
ময়ূরাক্ষী
গৃহকপোতী
সোমলতা
বহ্নুৎসব
ক্ষুধা
ক্ষণবসন্ত
শ্মশান ঘাট
হংসবলাকা
দেহ-যমুনা
কৃষ্ণা
হালদার সাহেব (নাটক)
ডাকাতের সর্দার

শ্রীপুর ষ্টেশনটিকে ফ্ল্যাগ ষ্টেশন বললেই ভালো হয়। না আছে ষ্টেশনের বাড়ী, না টেলিগ্রাফ, না সিগন্যাল। খানকয়েক ইটের উপর একখানা মালগাড়ী বসিয়ে রেখে সেইটে হয়েছে ষ্টেশন। ষ্টাট বাবু এবং জনকয়েক খালাসী এই হ'ল ষ্টাফ। মালপত্র এখানে নামে না, সব গাড়ীও দাঁড়ায় না। যে ক'খানি প্যাসেঞ্জার গাড়ী দাঁড়ায়, তার জন্তেও যাত্রী বিশেষ হয় না।

কিন্তু সেদিন এই নগণ্য ষ্টেশনটারই চেহারা বদলে গেল। ফুলে, পাতায়, পতাকায় এই ন্যাড়া ষ্টেশনটাই ঝলমল ক'রে উঠলো। যে প্ল্যাটফর্মে সাধারণতঃ লোক দেখাই যায় না, সেই প্ল্যাটফর্মেই লোক যেন ভেঙে পড়েছে।

ব্যাপারটা খুব গুরুতর কিছু নয়।

মহেন্দ্র আসছে।

মহেন্দ্র একজন মস্ত বড় ব্যক্তি নয়। এই গ্রামেরই জমিদারের ছোট ছেলে। মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ ক'রেই যুদ্ধে গিয়েছিল। বর্মায় ইংরেজ বাহিনী হেরে যেতে অন্যান্য অনেক অফিসারের সঙ্গে সেও বন্দী হয় এবং শেষে নেতাজির আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগদান করে।

তার পরের ইতিহাসও সকলেই জানে।

ইংরেজের হাতে বন্দী হয়ে মহেন্দ্রও অন্যান্য আজাদ হিন্দ্ অফিসারের সঙ্গে ভারতে ফেরে। সম্প্রতি তাঁদের সঙ্গে সেও ছাড়া পেয়েছে।

তারই সম্বর্ধনার জন্যে পাশাপাশি চার-পাঁচ খানি গ্রামের ছেলেরা মিলে এই আয়োজন ক'রেছে।

কিন্তু ট্রেন আর আসে না।

তিনটে-ছয়ে আসে। এখন চারটে বেজে গেছে। অথচ এঞ্জিনের ধোঁয়ার দেখা নেই। স্টেশনে টেলিগ্রাফ না থাকায় কখন ট্রেন আসবে, অথবা আদৌ আসবে কি না জানবার কোনোই উপায় নেই।

তবু অসহিষ্ণু ছেলের দল মাঝে মাঝে গিয়ে বেচারা ষ্টেশন-মাষ্টারের উপর হানা দিচ্ছে, যদি কোনো মানসিক বেতার প্রতিক্রিয়ায় তিনি কিছু বলতে পারেন।

এমন সময় বাইরে চিৎকার উঠলো : ওই ধোঁয়া, ওই ধোঁয়া!

হুঁা। অনেক দূরে বাঁকের মুখে ধোঁয়ার মতো কি যেন একটা জিনিষ দেখা যাচ্ছে। আর একটু পরেই বোঝা গেল, এঞ্জিনেরই ধোঁয়া। ট্রেন আসছে।

সমবেত জনতা তৎক্ষণাৎ সুশৃঙ্খলে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেল।

ষ্টেশনের কর্মচারীরাও চঞ্চল হয়ে উঠলো।

মাথায় পাগড়ী জড়িয়ে খালাসী দিলে ঘণ্টি বাজিয়ে। ষ্টেশনমাষ্টার টুপিটা মাথায় দিয়ে খাতাপত্র বগলে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

ট্রেন প্ল্যাটফর্মে থামতেই "নেতাজি কী জয়", "আজাদ হিন্দ্ ফৌজ কী জয়" ইত্যাদি ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠলো।

ধীরে ধীরে একটি ইণ্টার ক্লাস কামরা থেকে মহেন্দ্র নামলো। তার পরণে আজাদ হিন্দের পোষাক।

সম্বর্ধনার বিপুলতায় তার আর বিস্ময়ের শেষ নেই।

বললে, এ সব কি করেছ হে!

তার প্রশ্নের জবাব দেবার প্রয়োজনও কেউ অনুভব করলে না। শতকণ্ঠে আবার গর্জন উঠলো : নেতাজি কী জয়!

কাছের ছেলেটিকে চুপি চুপি মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, সব ভালো তো? তার উত্তর ডুবিয়ে আবার গর্জন উঠলো : আজাদ হিন্দ্ ফৌজ জয়!

মহেন্দ্রকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হ'ল। এবং একটা বিরাট শোভা-যাত্রার সঙ্গে তাকে বহু রাস্তা ঘুরিয়ে অবশেষে নিজের বাড়ীর দ্বারদেশে এনে হাজির করা হ'ল।

এইখানে এসে মহেন্দ্র থমকে দাঁড়ালো।

তাঁর কারণ আছে এবং সেটা জানা দরকার :

চিন্তাহরণবাবুর দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ নরেন্দ্র, কনিষ্ঠ মহেন্দ্র। গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে নরেন্দ্র বাপের সহকর্মীরূপে জমিদারী এবং তেজারতি দেখতে লাগলো। তার বেশি কিছু করার প্রয়োজনও ছিল না। চিন্তাহরণবাবুর জমিদারী বিশেষ বড় নয়, কিন্তু নগদ টাকা প্রচুর। লোকে সেই টাকার ঠিক পরিমাণ আন্দাজ করতে না পেরে তাকে 'টাকার কুমীর' ব'লে অভিহিত করত। তাঁর দশগুণ যাঁদের জমিদারী, তাঁদেরও তাঁর কাছে টাকা ধার করতে হ'ত। বস্তুতঃ আশে-পাশে বিশ ক্রোশের মধ্যে এমন জমিদার খুব কমই ছিলেন যিনি তাঁর কাছে ঋণগ্রস্ত ছিলেন না। নরেন্দ্র এই সমস্ত কাজে বৃদ্ধ পিতাকে সাহায্য করতে লাগলো।

মহেন্দ্র নরেন্দ্রের চেয়ে বছর দশেকের ছোট। শেষ বয়সের সন্তান ব'লে ছেলেবেলায় বাপ-মায়ের কাছে অত্যধিক আদর পেয়েছিল। সম্ভবতঃ তারই ফলে তার স্বভাব ভয়ানক একরোখা হয়ে উঠলো।

যেমন দেহে তেমনি মনে দুই ভাই সম্পূর্ণ বিপরীত। নরেন্দ্র দেখতে শ্যামবর্ণ, নাতিদীর্ঘ, ঈষৎ স্থূল; মহেন্দ্র তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, দীর্ঘদেহ এবং ছিপছিপে। নরেন্দ্র শান্ত, ধীর, স্বল্পভাষী; মহেন্দ্র চঞ্চল, উগ্র এবং অমিতভাষী। পড়াশুনায় নরেন্দ্র ছিল মাঝারি গোছের। সকালে-সন্ধ্যায় দুটি গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সে কোনোমতে দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে। মহেন্দ্র বড়লোকের ছেলের গৃহশিক্ষক নামধেয় মোসাহেবকে একেবারেই দেখতে পারত না। সে গৃহশিক্ষকের সাহায্য ব্যতীতই, শুধু

পাস ক'রে গেল না, একেবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলে। অথচ আশ্চর্য এই যে, নরেন্দ্র যখন পাস করলে তখন সব শিক্ষকই বারবার বলতে লাগলেন, স্কুলটা তার অভাবে অন্ধকার হয়ে গেল। ঐমন সত্যবাদী, বিনয়ী এবং সাধু ছাত্র তাঁরা কেউই সুদীর্ঘ শিক্ষক-জীবনে দেখেন নি। আর মহেন্দ্র যেদিন স্কুল থেকে বেরিয়ে এল, সেদিন সমস্ত শিক্ষকই এই উদ্ধত, শৃঙ্খলাভঙ্গকারী জমিদারপুত্রের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে মুক্তির নিশ্বাস ফেললেন।

নিজের চোখের সামনেই মহেন্দ্র উত্তরোত্তর যেরকম দুর্বিনীত ও খাম-খেয়ালী হয়ে উঠেছিল তাতে, সে এমন ভালো ক'রে পরীক্ষা পাস করলেও, চিন্তাহরণবাবুর তাকে উচ্চতর শিক্ষার জন্যে বাইরে পাঠাতে ঘোরতর অনিচ্ছা ছিল। কতকটা নরেন্দ্রের জন্যেই তিনি শেষ পর্যন্ত সম্মত হন।

ইন্টারমিডিয়েটেও মহেন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করলে এবং মেডিকাল কলেজে ভর্তি হ'ল। কিন্তু মাঝে মাঝে ছুটিতে যে ক'টা দিনের জন্যে মহেন্দ্র বাড়ী আসত, সেই ক'টা দিনেই তার নানা আচরণে এবং অনাচারে নিষ্ঠাবান চিন্তাহরণের চিত্ত তার বিরুদ্ধে তিক্ত হয়ে উঠতে লাগলো। মহেন্দ্রের সঙ্গে পারৎপক্ষে তিনি কথাই বলতে চাইতেন না।

এই তিক্ততা চরমে উঠলো যখন মেডিকাল কলেজ থেকে সসম্মানে উত্তীর্ণ হবার পর মহেন্দ্র কাকেও কিছু না ব'লে হঠাৎ যুদ্ধে চলে গেল।

তার পর থেকে যে সামান্য ক'টা বৎসর বেঁচে ছিলেন, তার মধ্যে মহেন্দ্রের নাম পর্যন্ত তিনি উচ্চারণ করতেন না। অন্য কেউ তাঁর কাছে মহেন্দ্রের উল্লেখ করতেও সাহস করতেন না। এমন কি মৃত্যুকালেও তিনি মহেন্দ্রের নাম মুখে আনেন নি।

ভারতবর্ষের ভিতর থেকে এবং বাইরে থেকেও মহেন্দ্র প্রথম-প্রথম যথানিয়মিত পিতাকে পত্র দিত। কিন্তু তার উত্তর পিতার পরিবর্তে নরেন্দ্রের কাছ থেকে আসত। আর কোনো মনিঅর্ডারই কেউই গ্রহণ

করতেন না। তার সম্বন্ধে পিতার মনোভাব তার অবিদিত ছিল না। সুতরাং এর অর্থ সে সহজেই উপলব্ধি করলে। অতঃপর চিঠি যা লিখত, দাদাকেই লিখত, এবং টাকা পাঠাত না।

পিতার মৃত্যু সংবাদ সে বেনগাজীতে থাকতে পেয়েছিল। তাঁর কথা স্মরণ ক'রে সে দ্বারপ্রান্তে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

এমন সময় বৃদ্ধ গোমস্তা রামলোচন এবং তার পিছু পিছু আরও কয়েকটি ভৃত্য ব্যস্তভাবে বাড়ীর ভিতর থেকে এসে সেই পথের ধূলোতেই গড় হয়ে প্রণাম করলে।

—চলুন, ভিতরে চলুন।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, দাদা কোথায়?

—তিনি বিশেষ জরুরী কাজে পরশু সদরে গেছেন। আজ সন্ধ্যার ট্রেনেই ফিরবেন।

ষ্টেশনে যে-সম্বর্ধনা মহেন্দ্র পেয়েছে তা সে প্রত্যাশা করেনি। কিন্তু যে-দাদাকে সে মনে-প্রাণে একান্ত ক'রে প্রত্যাশা করেছিল তাকেই না দেখে অজ্ঞাতসারে তার মনের মধ্যে অভিমান জমা হচ্ছিল। রামলোচনের কথায় সেই অভিমান বাষ্প হয়ে উড়ে গেল।

রামলোচন আবার বললে, ভিতরে চলুন। মা···

হ্যাঁ, এই মা। বিধবা জননীর সামনে সে যে কি ক'রে দাঁড়াবে ভাবতেই তার পা যেন অবশ হয়ে গেল। দাদা থাকলে এই সমস্যার মীমাংসা হ'ত সহজেই। কিন্তু সে তো নেই। ফিরবে সন্ধ্যায়। তার এখনও দেরি আছে।

জিজ্ঞাসা করলে, মা কেমন আছেন রামলোচন দা?

—যা ?—রামলোচন বললে,—সে কি জিগ্যেস করবার কথা ছোটবাবু ? নিজের চোখেই দেখবেন চলুন।

মহেন্দ্রের বুকের ভিতরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠলো।

বললে, এখন থাক রামলোচনদা। কাউকে বরং বলো, হাত-মুখ ধোবার জন্যে ওইখানে একটু জল দিয়ে যাক।

রামলোচন দ্বিধাগ্রস্তভাবে বললে, কিন্তু মা যে বড্ডই ব্যস্ত হয়েছেন ছোটবাবু।

—সে আমি জানি ভাই। কিন্তু আমার বুকের ভিতরটা কি রকম করছে বুঝতে পারছ না ? আমাকে একটু সামলাতে দাও। হাত-মুখ ধুই, এগুলো ছাড়ি, তারপর যাব।

ব'লে সেইখানে সিঁড়ির উপরেই মহেন্দ্র ব'সে পড়লো।

তার কথা শুনে এবং বসা দেখে রামলোচন হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠলো।

বিপদ যতক্ষণ সামনে এসে না দাঁড়ায় ততক্ষণই ভয়ঙ্কর। মায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম ঝাপটা কেটে যাওয়ার পরে মাতাপুত্রে শান্তভাবে গল্প করতে বসলো।

নরেন্দ্রের স্ত্রী সুবর্ণলেখা পাথরের গ্লাসে সরবৎ এবং পাথরের রেকাবীতে খাবার এনে অদূরে মহেন্দ্রের জায়গা করে দিলে।

কত দিন মায়ের সামনে সে খায়নি!

বিরাজমোহিনী তাঁর কম্বলের বিছানায় জড়োসড়োভাবে ব'সে ছিলেন। কী চেহারা হয়েছে তাঁর! কোথায় বা সেই কাঁচা সোনার বর্ণ, কোথায় বা সেই চুলের রাশি! এই ক'টা বছরেই মনে হয় যেন তাঁর বয়স কুড়ি বৎসর বেড়ে গেছে।

হঠাৎ বিরাজমোহিনী মহেন্দ্রকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, তোর চেহারাতো সারেনি বাছা!

মহেন্দ্র হেসে ফেললে। কারণ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। তার দেহ স্থূল হয়নি সত্য, কিন্তু সে ছিপছিপে দেহও আর নেই। বেশ বলিষ্ঠ হাড়ে-মাসে জড়ানো দোহারা চেহারা হয়েছে। কিন্তু তা সে বললে না।

বললে, সারবে কি মা? তোমার সামনে ব'সে না খেলে এই বুড়ো বয়সেও আমার পেট ভরে না।

বিরাজমোহিনী খুশি হলেন। কারণ কথাটা মিথ্যা নয়। ছেলেবেলা থেকেই মহেন্দ্রের খাওয়া ব্যাপারটা যুদ্ধের মতো। টাল-বাহানা, ছলছুতা রাগারাগির আর অন্ত থাকতো না। কতদিন যে থালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে না খেয়েই সে স্কুল গেছে তার ইয়ত্তা নেই। সেইজন্যে তার খাবার সময়

শত কাজ ফেলেও বিরাজমোহিনীকে তার সামনে উপস্থিত থাকতেই হ'ত। সেইটেই বোধ করি অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে।

সুবর্ণলেখা জিজ্ঞাসা করলে, তোমার সেই চণ্ডাল-রাগ এখনও আছে ঠাকুরপো?

মহেন্দ্র সহাস্যে উত্তর দিলে, কি জানি বৌদি, পরীক্ষা ক'রে দেখবার সুযোগ পায়নি। যাদের সঙ্গে এই কটা বছর কাটালাম, তাদের উপর ও বস্তুটা পরীক্ষা ক'রে দেখা সর্বত্র নিরাপদ নয়। রণক্ষেত্রে রাগ অনুরাগের চাষ নেই।

—তাহ'লে আশা করি ওটা ভুলেই গেছ?

—আজ সন্ধ্যায় তো সেই আশাই করা যাক বৌদি। তার পরে রইলে তুমি আর রইলাম আমি, আর রইল লম্বা ভবিষ্যৎ।

ব'লেই মহেন্দ্র অট্টহাস্য ক'রে উঠলো।

সুবর্ণ শাশুড়ীর দিকে চেয়ে সভয়ে বললে, দেখছেন মা, সেই ছাদ-ফাটানো হাসিটা এখনও আছে!

কৃত্রিম বিস্ময়ে মহেন্দ্র বললে, আশ্চর্য! ওটা যে এখনও আছে, সে আমি নিজেই জানতাম না।

বিরাজমোহিনী হেসে ফেললেন। বললেন, তাহ'লে তোর সব রিপুই ঠিক ঠিক আছে বাছা। আবার বৌমার চোখের জলে নাকের জলে এক হবে দেখছি।

—না মা, দেখো,—মহেন্দ্র সবিনয়ে বললে,—এবার আর সে সব কিছু হবে না। বৌদি, কাল থেকে রান্নাঘরে তোমাতে আর আমাতে। এমন কতকগুলো নতুন রান্না তোমাকে শিখিয়ে দোব, যা জীবনে কখনও খাওনি।

শাশুড়ীর দিকে অপাঙ্গে চেয়ে সুবর্ণ বললে, আচ্ছা। দেখা যাবে।

বিরাজমোহিনী জিজ্ঞাসা করলে, ওখানে তোরা কি খেতিস?

—কি খেতাম না তাই জিজ্ঞাসা কর।—বলেই তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে বললে,—যুদ্ধের সময় খাওয়ার কি কিছু ঠিক থাকে মা! যখন যা জোটে।

কিন্তু বিরাজমোহিনী তাতে ভুললেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, যত সব অখাদ্য খেতিস, না?

মহেন্দ্র হেসে হাত জোড় ক'রে বললে, ওসব জানতে চেও না মা।

বিরাজমোহিনী নিজের মনেই জিজ্ঞাসা করলেন, রেঁধেও দিত নিশ্চয় যে-সে জাতের লোক, কি বলিস?

—বললাম তো মা, ওসব জিজ্ঞাসা কোরো না।

বিরাজমোহিনী শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে নরেন্দ্র এল।

—এই যে! ভালো ছিলে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মহেন্দ্র দাদার পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই নরেন্দ্র তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, আঃ!

আরামের, স্বস্তির, তৃপ্তির এই একটি শব্দে যেন মহেন্দ্রের অশ্রু-সাগর উদ্বেল হয়ে উঠলো। আর তাকে রোখা গেল না। মহেন্দ্র দাদার কাঁধে মাথা রেখে শিশুর মতো ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

নরেন্দ্র বাধা দিলে না। শুধু নিঃশব্দে, গভীর স্নেহে তার মাথার চুলে হাত বুলোতে লাগলো।

মায়ের ঘর থেকে নরেন্দ্র ওকে নিয়ে গেল বাইরে।

ওদের বাড়ী থেকে খানিকটা দূরেই একটা চমৎকার বাগান-বাড়ী আছে।

সরকারী কর্মচারী অথবা কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির গ্রামে আবির্ভাব হ'লে সেইখানে স্থান দেওয়া হয়।

বাগানবাড়ীটা চিন্তাহরণবাবুর আমলকার। সুতরাং মহেন্দ্রের অপরিচিত নয়। কিন্তু এবারে যেন জাঁকজমক আরও বেশি মনে হ'ল। ঘরের আসবাবপত্র বেশ মূল্যবান এবং নতুন-নতুন। সেই পুরোণো আসবাব-গুলো কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে। সব চেয়ে মহেন্দ্র আশ্চর্য হ'ল ইলেকট্রিক লাইট দেখে।

বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, এ সব কবে হ'ল?

—তা বছর চারেক হ'ল। বাড়ীতেও তো হয়েছে, দেখলে না?

—না, অতটা খেয়াল করিনি। এ তো অনেক খরচ! বিশেষ পাড়া-গাঁয়ে···

—তা কি করবে ভাই। দু'টাকা আনতে গেলে চার আনা খরচের ভয় করলে তো চলবে না।

কথাটার ভিতরের অর্থ মহেন্দ্র ঠিক বুঝতে পারলে না। কিন্তু তা নিয়ে আর কোনো প্রশ্নও করলে না।

নরেন বললে, চলো তোমার শোবার ঘরটা দেখাই গে।

বিস্মিতভাবে মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, আমি কি এ বাড়ীতে শোব না কি?

এতক্ষণ পরে নরেন একবার হা হা করে হাসলে।

বললে, এই বাড়ীর পিছনে আমি দশ হাজার টাকা খরচ করেছি মহিন। এর শোবার ঘর থেকে বসবার ঘর, খাবার ঘর, মায় বাথরুম পর্যন্ত একটিও সেই পুরোণো জিনিস কোথাও দেখতে পাবে না। এই দুদিনেও দামী দামী জিনিস আনিয়ে সাজিয়েছি। বাবা ভাবতেন, আমি বুঝি দারোগা-ম্যাজিষ্ট্রেটদের জন্যে এত কাণ্ড করছি। প্রায়ই বলতেন, এত টাকা ওদের পিছনে খরচ করছ কেন? তার জবাব বাবাকে দিতে পারিনি, কিন্তু মাকে বলেছি। মা জানেন এসব কার জন্যে।

—আমার জন্যে ?

নরেন সে প্রশ্নের জবাব দিলে না। আপন মনেই অস্ফুটস্বরে বলতে লাগলো :

ভগবান মুখ রাখবেন কি না জানতাম না। ভয়ে তাই মুখ ফুটে কাউকে বলিনি যে, আমারও ভাই ইউরোপ থেকে ফিরে আসছে। জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে তারও মূল্য কম নয়। সে যদি ফিরে আসে, এই বাড়ীতে তাকে যদি রাখতে পারি, তবেই আমার খরচ সার্থক হবে। রাধাবল্লভ আমার মুখ রেখেছেন। কালকেই তাঁর ভোগের ব্যবস্থা হবে।

মহেন্দ্র কি সিনেমা দেখছে ?

শোবার ঘরে গিয়ে দেখে, বিলিতি কায়দায় অত্যন্ত মূল্যবান আসবাব দিয়ে ঘরখানি পরিপাটি ক'রে সাজানো হয়েছে। মশারি থেকে বিছানা এবং বিছানার চাদর পর্যন্ত সমস্ত নতুন। তার বুঝতে বিলম্ব হ'ল না, এ সমস্তই দাদা তারই জন্যে কিনে এনেছে।

তার উপর এই স্বল্পভাষী, শান্ত দাদার স্নেহ চিরদিনই অপরিসীম। তার অনুপস্থিতিতে সেই স্নেহ কোথায় পৌঁছেচে, ভাবতে তার চোখ ছলছল ক'রে উঠলো।

কিন্তু সেই অশ্রুবাষ্প মুহূর্তে উবে গেল, যখন ধোপ দুরস্ত উর্দী প'রে ইব্রাহিম সসম্ভ্রমে সেলাম ক'রে জানালে ডিনার তৈরী।

—এ সব কি দাদা ?

—কিছুই তো নয় ভাই। ছ'বচ্ছর ইউরোপে কাটিয়ে তুমি ডাঁটা-চচ্চড়ি খেতে চাইলেও আমি তো দিতে পারি না।

—কিন্তু আমি তো সত্যিই সাহেব হইনি দাদা ?

—ওরে বাবা, তুমি হ'লে মেজর। পাড়াগাঁয়ের মুরুক্ষু দাদা ব'লে কি আমি কিছুই জানিনে ভাই ? নাও, ওঠো।

মহেন্দ্র দাদার সঙ্গে কখনও তর্ক করেনি। আজও তর্ক করলে না।

বস্তুতঃ নরেন্দ্র এমনই নিরীহ এবং মিতভাষী যে তার সঙ্গে তর্ক কিংবা কলহ করাই যায় না। সে স্থির করলে সকালে উঠে বৌদির সঙ্গে এবিষয়ে মীমাংসা করবে।

সে নিঃশব্দে খাবার টেবিলে গিয়ে বসলো।

নরেন্দ্র বললে, রাত হয়ে যাচ্ছে। আমার এখনও সন্ধ্যাহ্নিকও হয়নি। এবার আমি উঠি, কি বল?

নরেন্দ্র চলে যেতে ইব্রাহিম একে একে খানা সাজিয়ে দিতে লাগলো। লোকটা পাশের গ্রামের খান বাহাদুরের বাড়ীতে অনেক দিন বাবুর্চিগিরি ক'রেছে। রাঁধে ভালো। মহেন্দ্রের মনে যেটুকু উত্তাপ জমেছিল, ইব্রাহিমের হাতের রান্না খেয়ে তা শান্ত হ'ল। দ্বিতীয় কোনো সঙ্গী না থাকায় সে ইব্রাহিমের সঙ্গেই গল্প আরম্ভ করলে।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, কেমন আছ ইব্রাহিম? যা সাজ ক'রেছ, আমি তো প্রথমে চিনতেই পারিনি। এ বাড়ীতে কদ্দিন থেকে?

—তা বছর তিনেক হবে বাবু। কর্তাবাবুর আমল থেকেই।

—বলো কি? কর্তাবাবুর আমল থেকে?

—জি হ্যাঁ। যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বড়বাবু চালানি কারবার আরম্ভ করলেন। সাহেব-সুবোর আসা যাওয়া বাড়তে লাগলো। বড়বাবু ডেকে বললেন, ইব্রাহিম, বুড়ো বয়সে কেন বিদেশে প'ড়ে থাকো। সাহেব-সুবোদের খানা পাকাবার জন্যে আমার তো একজন লোকের দরকার। তুমি ওখানে যা পাও, তাই দোব।

—বড়বাবু চালানি কারবার আরম্ভ ক'রেছেন বুঝি?

—জি হ্যাঁ। তা এ আমার ভালোই হয়েছে বাবু। রোজই আর সাহেব-সুবো আসে না, আমাকেও খানা পাকাতে হয় না। একবার ক'রে

এসে বাড়ীঘরের খবরদারী করি আর বাড়ীতে ব'সে চাষ-বাসও করি। খানা ভালো হয়েছে তো বাবু?

—চমৎকার হয়েছে। বড়বাবু কিসের চালানি করেন ইব্রাহিম?

—চাল-ধান আছে। গরু-ভেড়া-মুর্গিও মাঝে মাঝে করেন দেখতে পাই। ঠিকেদারীও আছে। সব আমি জানিনে বাবু।

—হুঁ। সাহেব-সুবো প্রায়ই আসেন বুঝি?

—প্রায়ই। তাছাড়া দারোগা বাবু, হাকিম বাবু, আরও সব অনেক বাবু প্রায়ই আসেন।

—তাঁরা কেন আসেন জানো?

মহেন্দ্রের অজ্ঞতায় ইব্রাহিম পর্যন্ত হেসে ফেললে। বললে, তাঁদের সঙ্গেই তো কারবার ছোটবাবু। আপনি বাইরে ছিলেন, বেলাক-মার্কেটের ব্যাপার বুঝবেন না।

—ও, ব্ল্যাক মার্কেট!—ব্যাপারটা এতক্ষণে মহেন্দ্র পরিষ্কার উপলব্ধি করলে।

তার দাদা এতদিন ধ'রে চোরাকারবার ক'রে এসেছে তাহ'লে। তাই এত ঐশ্বর্য! বিজলী আলো এবং বাগান-বাড়ীতে সাহেব-সুবো নিয়ে এত সমারোহ! তাদের বাড়ী-ঘর-দোরের এবং চালচলনের উন্নতি এসে পর্যন্তই সে লক্ষ্য করছে। এত দাস-দাসী, আমলা কর্মচারী তাদের আগে ছিল্‌না। বাইরের সেরেস্তায় রামলোচন এবং আর একজন মাত্র কর্মচারী ছিল। ভালো ক'রে সে লক্ষ্য করেনি, তবু একবার মনে হয়েছিল, সমস্ত সদরটাই যেন কি রকম জমজমাট।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, দাদা বোধ হয় অনেক টাকা রোজগার করেছেন, না ইব্রাহিম?

—টাকা?—ইব্রাহিম সগর্বে নিজের পাকা দাড়িতে একবার হাত বুলিয়ে বললে,—এদিগরে এখন আপনাদের চেয়ে বেশি টাকা কারও নেই ছোটবাবু!

—বলো কি হে ?

—সত্যি কথাই বলেছি ছোট বাবু। সর্বানন্দপুরে উড়োজাহাজের যে ঘাঁটি হ'ল না, শুধু তাতেই তো বড়বাবু ছ'লাখ টাকা কামিয়েছে শুনেছি।

—সর্বানন্দপুরে আবার একটা ঘাঁটি হয়েছে নাকি ?

—হয়নি ছোটবাবু, শুধু একবার হওয়ার ব্যবস্থা হ'ল আর একবার ভেঙ্গে গেল। আমাদের বড়বাবু শাঁখের করাতের মতো যেতেও কাটলেন, আসতেও কাটলেন।

ইব্রাহিম হাসলে।

মহেন্দ্রের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর কোন কথা না ব'লে সে হাত মুখ ধুয়ে শুতে চলে গেল। ট্রেনের ভ্রমণ, শোভাযাত্রার সঙ্গে পরিভ্রমণ প্রভৃতিতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আর ব'সে থাকতে পারলে না।

সকালে ছোট হাজরি খেয়ে মহেন্দ্র বেরুলো।

অনেক দিন পরে গ্রামে ফিরে গ্রামখানিকে তার নতুন-নতুন লাগছিলো। ছোট-খাটো কত পরিবর্তন যে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কত খালি জায়গায় জঙ্গল গজিয়েছে, জঙ্গল জায়গা ফাঁকা হয়েছে। কত নতুন বাড়ী উঠেছে, কত পুরোণো বাড়ী ভেঙ্গে গেছে।

এই সমস্ত দেখতে দেখতে কত পুরোণো স্মৃতিই না তার মনে আসছিল। হঠাৎ এক সময় দেখলে সে তাদের সদর বাড়ীর মস্ত বড় উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে।

কাল বিকেলে বাড়ীর এই অংশটাকে তার বেশ জমজমাট মনে হয়েছিল। কিন্তু সত্যকার অবস্থার তুলনায় সে কিছুই নয়। এখন বুঝলে কত লোক তাদের সেরেস্তায় কাজ করে।

পূব এবং দক্ষিণ দিকের সমস্ত ঘরগুলোই কর্মচারীতে ভর্তি। ফরাস নয়, সমস্ত টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা। শুধু পশ্চিম দিকের বড় ঘরখানার ফরাস আগের মতোই আছে। ওখান থেকে বৃদ্ধ রামলোচনের শীর্ণ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে আসছিলো।

জমকালো বেশি উত্তর দিকের অংশটা। দ্বারে একটা সবুজ রঙের পর্দা ঝুলছে। বাইরে টুলের উপর ব'সে একজন চাপরাসি।

মহেন্দ্র নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলো। হঠাৎ কার দৃষ্টিতে সে প'ড়ে যেতেই সমস্ত সদরটা মুহূর্ত মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠলো এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিকের ঘরখানার পর্দা সরিয়ে নরেন হাসিমুখে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

—এসো, এসো।—নরেন হাসতে হাসতে বোধ করি সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলতে লাগলো :

—তুমি তো চিরকালই উঠতে দেরি কর। ভেবেছিলাম, এখনও ওঠোইনি বুঝি। ইউরোপে গিয়ে তোমার আগেকার অভ্যেস যে বদলে গেছে, সে কথা ভাবিইনি। চা খাওয়া হয়েছে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—চলো তোমাকে সব ঘরগুলো দেখিয়ে আনি। দেখেই বুঝতে পারছ বোধ হয়, পশ্চিম দিকের ওটা হ'ল আমাদের সেই জমিদারী সেরেস্তা,—সেই রামলোচন ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এই উত্তর দক্ষিণ পূর্ব সমস্তটা হচ্ছে সি, এইচ, মুখার্জি এণ্ড সন্স। প্রায় একশো জন কর্মচারী এখানে কাজ করেন। সবই এই গ্রামের, নয়তো কাছাকাছি গ্রামের ছেলে। অনেককেই তুমি চেন।

অধিকাংশই মহেন্দ্রের চেনা মুখ। এরা সবাই তাদের গ্রামের স্কুল থেকেই পাশ করেছে। কেউ তার উপরে পড়তো, কেউ সঙ্গে, কেউ বা নিচে। তাকে দেখে সবাই সশ্রদ্ধভাবে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে বিভূতির ভক্তিনম্র মুখের দিকে চেয়ে তার পক্ষে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হয়ে পড়লো।

এই বিভূতি বোধ করি নরেনদের কিছু নিচে পড়তো। মহেন্দ্র গিয়ে তার সঙ্গ ধরলো এবং পরের বৎসর তাকে ছাড়িয়েও চ'লে গেল। কিন্তু সেই এক বৎসরের মধ্যেই যে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, মহেন্দ্র যুদ্ধে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল।

মেধা ছাড়া অন্য অনেক বিষয়ে উভয়ের মধ্যে একটা আশ্চর্য মিল ছিল! উভয়েই উচ্ছৃঙ্খল, খামখেয়ালী এবং স্নেহপরায়ণ। তা ছাড়া আর একটা বিভূতির ভগবদ্দত্ত ক্ষমতা ছিল, মুখে মুখে অনর্গল কবি-গান গাওয়া। এই সেদিনও, যুদ্ধে যাওয়ার আগে যখন সে বাড়ী এসেছিল, বিভূতির বাড়ী গিয়ে মুড়ি আর আলুর দম খেয়ে এসেছে। সেই বিভূতির এত ভক্তি!

মহেন্দ্র উচ্ছ্বাসের সঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠলো, কিরে বিভূতি, কেমন আছিস ?

বিভূতি কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু নরেনের শান্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বরে সে থমকে গেল।

নরেন গম্ভীর বিরক্ত কণ্ঠে বললে, আমার ঘরে এসো মহিন, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

কথা আর কিছুই নয়, গুটিকয়েক মূল্যবান উপদেশ।

নরেন্দ্র তাকে বুঝিয়ে বললে, এ গ্রামে এবং পাশাপাশি কয়েকটি গ্রামেও ম্যাট্রিক পাশ করা খুব কম ছেলেই আছে যারা সি, এইচ, মুখার্জি এ্যাণ্ড সন্সে চাকুরী করে না। যারা এখানে চাকরী করে তাদের সকলেই মহেন্দ্রের পরিচিত। কাউকে মহেন্দ্র দাদা বলে, কেউ বা বন্ধু। কিন্তু সেসব মহেন্দ্রকে ভুলে যেতে হবে। নইলে চাকুরীর ক্ষেত্রেও তারা এই সম্পর্কের সুযোগ নেবে। মহেন্দ্রকে সব সময় মনে রাখতে হবে, সে তাদের মনিব। নইলে তারা কাজে ফাঁকি দেবে, এবং এত বড় কারবার শেষ পর্যন্ত ফেল পড়ে যাবে।

মহেন্দ্র বললে, কিন্তু আমি তো এখানে থাকছি না দাদা! আমি ক'লকাতায় প্র্যাকটিস করতে বসছি।

—অবশ্য। মেজর এম, এন, মুখার্জি ধান-চালের আর এটা-ওটার ব্যবসা নিয়ে জীবন কাটাতে পারে না। সে আমিও জানি।—নরেন সগর্বে বললে, কিন্তু যেখানেই থাক, তুমি ওদের মনিব। সেইটেই ওদের সঙ্গে তোমার সত্যকার সম্পর্ক।

কথাটা মহেন্দ্রের ভালো লাগলো না।

বললে, আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করছি না দাদা। কিন্তু আমি যদি দেশে না থাকি এবং কারবারও না দেখি, তাহ'লে ওদের সঙ্গে পুরোণো সম্পর্ক বজায় রাখলে ক্ষতি কি?

—ক্ষতি? ক্ষতি অনেক। ছ' বচ্ছর ওদের আমি চরাচ্ছি, ওদের চিনি না? ওরা এক দুঃখ দশখানা ক'রে তোমার কাছে দরবার করবে। হয়তো আমার বিরুদ্ধেও তোমার কাছে লাগাবে।

এবারে মহেন্দ্র হেসে ফেললে।

বললে, এক দুঃখ দশখানা ক'রে দরবার হয়তো করতে পারে, কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে আমার কাছে লাগাতে সাহস করতে পারে, এ নিশ্চয় আপনি বিশ্বাস করেন না।

—করি ভাই, করি। এর চেয়েও বেশি বিশ্বাস ওদের 'পরে আমার আছে।

নরেন্দ্র হাসতে লাগলো।

তারপর বললে, যাক সে কথা। তুমি যাবার কথা যখন তুললে তখন বলি, আসছে মাসের চার তারিখের মধ্যে তোমার যাওয়া তো হ'তে পারে না।

—কেন?

—চার তারিখে আমাদের নতুন ব্যাঙ্কের উদ্বোধন।

—ব্যাঙ্ক!

—হ্যাঁ। তোমাকে সব কথা বলা হয়নি। সেদিন সদরে গিয়েছিলাম এই ব্যাঙ্কটি নিয়েই,—পীপ্‌ল্‌স্ ওন ব্যাঙ্ক। আমাদের শ্রীপুরে তার শাখা খুলছি। দত্তদের বাড়ীটা কেনা হ'য়ে পড়েই আছে। এই ক'দিনে সেটাকে বেশ ক'রে মেরামত করতে হবে। ওই বাড়ীটায় ব্যাঙ্ক হবে। ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর রাজি হয়েছেন উদ্বোধন করতে।

—তাতে আমার কি কোন কাজ আছে?

—কিচ্ছু না। কাজ যা সে আমিই করব। তুমি শুধু তোমার মেজরের পোষাকটা প'রে ম্যাজিষ্ট্রেটের ডান দিকে বসে থাকবে। তিনি তোমাকে খাতির করবেন সেইটে দেখব, আর এই হতভাগা গাঁয়ের লোকগুলোকে দেখাব।

সমস্ত কাজ ফেলে ম্যাজিস্ট্রেট কেন যে মহেন্দ্রকে খাতির করতে লেগে যাবেন সে [illegible] জানে। মহেন্দ্র শুধু এইটুকু বুঝলে যে তার সম্বন্ধে তার দাদা এ[illegible] অসম্ভব রকমের আকাশ-কুসুম রচনা করেছে। এখনি তাতে আঘাত দিতে মহেন্দ্রের করুণা হ'ল।

শুধু বললে, বেশ। তাই হবে।

তারপর উঠতে উঠতে বললে, আমি ভিতরে চললাম দাদা। বৌদির সঙ্গে একটু···

—ঝগড়া আছে ? যাও। কিন্তু তোমার লাঞ্চ ক'টায় ?

লজ্জায় মহেন্দ্র আর সে কথার জবাব দিলে না। এক রকম দৌড়েই ভিতরে চ'লে গেল।

ভিতরে ঢুকতে সামনেই স্বর্ণলেখা।

মহেন্দ্রকে দৌড়ে ঢুকতে দেখে স্বর্ণ কৃত্রিম উদ্বেগে জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার! মেজর সাহেবকে কেউ তাড়া করলে না কি ?

—হ্যাঁ।

—কে সে ?

—মেজর সাহেবের দাদা স্বয়ং। কিন্তু তোমরা আমাকে কি ভেবেছ বল তো ? আমিই সত্যিই সাহেব হয়ে গেছি ?

স্বর্ণর পরিহাস-তরল মুখের উপর হঠাৎ যেন একটা কাঁলো ছায়া পড়লো।

জিজ্ঞাসা করলে, কেন বলো তো ?

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, আমি শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পেটের দায়ে ডাক্তারী চাকরী নিয়ে যুদ্ধে গিয়েছিলাম। তার জন্যে দাদা আমাকে সাহেব সাজিয়ে বাগানবাড়ীতে বসিয়ে রাখতে চান কেন ?

স্বর্ণ নিরীহভাবে উত্তর দিলে, সে আমি কি ক'রে জানব ভাই?

—নিশ্চয়ই জানো। তুমি জানো না দাদার এমন কোনো ব্যাপা থাকতে পারে না।

স্বর্ণ গম্ভীরভাবে বললে, সত্যিই আমি জানি না ভাই। আ মনে হয়...

—কি মনে হয়?

স্বর্ণ হেসে বললে, বোধ হয় তাঁর ধারণা ইউরোপ থেকে তুমি একটা কেও-কেটা হয়ে ফেরোনি।

মহেন্দ্র বললে, দাদার সেই ভুলটাই তুমি ভেঙ্গে দাও বৌদি। আমি নিতান্তই সাধারণ একটি ব্যক্তি। বাড়ী এসেছি বৌদির হাতে ঝাল-ঝোল-সুক্ত খেতে, ইব্রাহিম মিঞার হাতে ফাউল-কারি খেতে নয়। এইটে তুমি, যেমন করে হোক, দাদাকে বুঝিয়ে দাও।

ওর আগ্রহাতিশয্য দেখে স্বর্ণ নিঃশব্দে কি যেন চিন্তা করলে। তারপর বললে, আমি চেষ্টা করব ঠাকুরপো। কিন্তু তোমার দাদাকে তো জানো কি রকম একজেদী।

—আমি তো তাঁকে তোমার একান্ত অনুগত ব'লেই জানতাম। এ রকম একজেদী তো তিনি ছিলেন না।

—সেইটেই তুমি ভুল জানতে ঠাকুরপো। উনি তোমারই মত একজেদী চিরকাল। শুধু তোমার মতো মুখে রাগারাগি করেন না।

—তাহ'লে এখন উপায়?

—জানিনে। কিন্তু উনি যখন ধরেছেন গ্রামের সকলের সামনে তোমাকে সাহেব সাজিয়ে দাঁড় করাবেন, সকলের কাছে তোমার মর্যাদা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমান ব'লে প্রতিপন্ন করবেন, তখন সহজে থামবেন ব'লে মনে হয় না। আমার মনে হয়, এই স্নেহের অত্যাচার অন্ততঃ কিছুদিন নীরবে সহ্য ক'রে যাওয়াই উচিত। পারবে না?

—পারব। কিন্তু তার বদলে আমার কাছে তোমাকেও একটা কথা দিতে হবে।

—কি বল?

—রোজ দুপুরে চুপি চুপি তোমাকে আমার জন্যে ভাত পাঠিয়ে দিতে হবে। ইব্রাহিম লোকটি ভালো। আশা করি কখনই দাদাকে ব'লে দেবে না। বরং দিনের রান্নার দায় থেকে অব্যাহতি পেয়ে নিশ্চয় আমাদের আশীর্বাদই করবে।

—কিন্তু আমার রান্না কি এখন তোমার ভালো লাগবে ঠাকুরপো?

—খুব ভালো লাগবে বৌদি। কিন্তু সে তো তুমি চোখে দেখতে পাবে না। সত্যি বলছি তোমাকে, রাত্রের ডিনার যদি বা পারি, দিনের লাঞ্চ উপর্যুপরি কয়েকদিন খেতে হ'লেই একদিন পালাব।

স্বর্ণ হেসে বললে, আচ্ছা, পালাতে আর হবে না মশাই। দিনের খাবারটা যেমন ক'রেই হোক পাঠিয়ে দোব। তাহ'লেই হবে তো?

এই মন্দের ভালো ব্যবস্থায় মহেন্দ্র খুশি হয়ে গেল।

চার

মহেন্দ্র বাগান বাড়ীতে ফিরতেই ইব্রাহিম জানালে, গোসলখানায় পানি দেওয়া হয়েছে। জানতে চাইলে ছোটবাবু এখন গোসল করবেন কিনা।

বৌদির কাছ থেকে ফিরে মহেন্দ্রের মনটা খুশি হয়ে ছিল। পরিহাসের ভঙ্গিতে বললে, না, বাবা ইব্রাহিম, গোসলখানায় নয়, নদীতে রীতিমত অবগাহন স্নান ক'রে আসব। তেল-টেল আছে?

ইব্রাহিমের চোখ বিস্ময়ে কপালে উঠলো।

বললে, তেল!

জামা ছাড়তে-ছাড়তে মহেন্দ্র জবাব দিলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তেল। মাখবার তেল। বললাম না, নদীতে চান করতে যাব? নেই তেল?

ছোটবাবু সাহেব হয়ে ফিরেছেন ভেবে ইব্রাহিমের মহেন্দ্রের উপর শ্রদ্ধা জেগেছিল। তেলের কথায় সে রীতিমত ক্ষুণ্ন হ'ল। কোনো রকমে ঘাড় নেড়ে জানালে, আছে।

—নিয়ে এস। আর দেখ, একজন কাউকে বলো আমার কাপড়-জামা নদীর ঘাটে নিয়ে আসতে।

মহেন্দ্র সাবান নিলে না, কিচ্ছু না। শুধু মাথায় একটু সর্ষের তেল ঘ'ষে খোলা গায়ে একখানা তোয়ালে জড়িয়ে ঘাটে গেল।

ইব্রাহিমের মনটা আরও খারাপ হ'য়ে গেল।

নদীর ঘাট দূরে নয়। একটু যেতেই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সঙ্গে মহেন্দ্রের দেখা। তিনি স্নানান্তে একখানি গামছা প'রে ভিজে কাপড়খানি

কাধে ফেলে, বাহাতে জলপূর্ণ কমণ্ডলু নিয়ে মৃদু অথচ সুস্পষ্ট কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ করতে করতে ফিরছিলেন।

মহেন্দ্র সেইখানে গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ভালো আছেন পণ্ডিতমশাই?

—কে? মহেন্দ্র? বেশ, বেশ। কল্যাণ হোক বাবা। ভালো আছ তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

তর্কালঙ্কারমশাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মহেন্দ্রের গলায় যজ্ঞোপবীতটা খুঁজছিলেন। সেখানে না পেয়ে সে-দৃষ্টি তার কোমরের দিকে নেমে এল। সেখানেও যজ্ঞোপবীতের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না।

অবশেষে ভগ্নকণ্ঠে তিনি বললেন, পৈত্রিক ধর্মটা কি একেবারেই ত্যাগ করেছ বাবা?

মহেন্দ্র ব্যথিত বিস্ময়ে বললে, আজ্ঞে না। ধর্মত্যাগ করব কেন?

আশ্বস্তভাবে তর্কালঙ্কারমশাই বললেন, বাঁচালে বাবা। পৈতেটা দেখছিলাম না কি না, ভাবলাম···

উপবীত মহেন্দ্রের সত্যই ছিল না।

নিজেকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে বিব্রতভাবে বললে, ধর্মত্যাগ করব কেন পণ্ডিতমশাই? হিন্দু ছিলাম, হিন্দুই আছি।

—বেশ, বাবা, বেশ।

তর্কালঙ্কারমশাই বাড়ীর দিকে চলে গেলেন। মহেন্দ্রও নদীর ঘাটের দিকে চললো।

ঘাটে অনেক লোক স্নান করছিলো। কিন্তু নদীর সুশীতল জল এমনই ক'রে তাকে টানছিল যে, কারও দিকে চাইবার পর্যন্ত তার ফুরসুৎ ছিল না। সে ছেলেবেলার পুরানো দিনের মতো গামছাটা দাঁত

দিয়ে চেপে ধ'রে পাড়ের উপর থেকেই সেই শীতল কালো জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আঃ!

সুবর্ণলেখা তার কথা রেখেছিল। কিছু তরকারী লুকিয়ে পাঠিয়েছিল কথা হয়েছে, কাল থেকে দিনের সমস্ত রান্নাই বাড়ী থেকে আসবে ইব্রাহিম একবেলা রান্নার পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি পেয়েও খুব খুশি হ'ল ব'লে মনে হ'ল না। ছোটবাবু যেন তাকে প্রবঞ্চিত করেছে, প্রতারিত করেছে, দস্তুরমতো হতাশ করেছে।

মহেন্দ্র দুপুরটা শুয়ে, বই প'ড়ে কাটালে। দিনে ঘুমোনো তার অভ্যাস নেই। সি, এইচ, মুখার্জি এ্যাণ্ড সন্সের আফিস প্রাচীন দেশীমতে সকালে বিকেলে বসে। মহেন্দ্র গোপনে বিভূতিকে একখানা চিঠি পাঠিয়েছে, সন্ধ্যার পরে তার সঙ্গে বাগানবাড়ীতে দেখা করবার জন্যে।

ইতিমধ্যে কি করা যায়?

বিকেলে পাঞ্জাবীটা গায়ে চড়িয়ে মহেন্দ্র নদীর ধারে বেড়াবার জন্তে বেরিয়ে পড়লো।

ওই দূরে দেখা যাচ্ছে তাদের খেলার মাঠ। এখনও ছেলেরা সেখানে খেলা করে কিনা কে জানে। গোলের খুঁটি তো নেই। তার এদিকেই ছিল একটা প্রকাণ্ড শিমুল গাছ। সেটাও নেই। তার গুঁড়ির খানিকটা শিকড় সমেত উল্টে প'ড়ে আছে। হয় ঝড়ে, নয় নদীর ভাঙ্গনে সেটার এই দুরবস্থা হয়েছে বোধ হয়।

ঘাটের অদূরে সেই করবীগাছের ঝোঁপটি এখনও রয়েছে। সেইখানে এসে মহেন্দ্র একটুখানি দাঁড়ালো। অনেক স্মৃতি জড়ানো রয়েছে এই জায়গাটির সঙ্গে।

বস্তুতঃ গায়ত্রীর সঙ্গে তার একবার বিয়ের কথাও উঠেছিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা, চিন্তাহরণবাবু উপেক্ষার সঙ্গে সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

করবীঝাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে গায়ত্রীর কথা মনে হ'তেই তার বুকটা কি রকম একটা অজানিত বেদনায় টনটন করে উঠলো।

কে জানে কোথায় তার বিয়ে হ'ল। এখন সে কোথায় কি ভাবে আছে তাই বা কে জানে?

মহেন্দ্র স্থির করলে, কাল একসময় ওদের বাড়ী গিয়ে খোঁজ নিতে হবে। কিংবা বিভূতি তো সন্ধ্যার পরে আসবে, তার কাছেও খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। তারই তো খুড়তুতো বোন।

গায়ত্রীর বাবা বেণীমাধব বাঁড়ুয্যে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, যজমানী ক'রে কায়ক্লেশে দিনযাপন করেন। ভদ্রলোক মহেন্দ্রকে বড় স্নেহ করতেন। তিনি বেঁচে আছেন কিনা কে জানে? বেঁচে থাকলে নিশ্চয় তিনি একবার দেখা করতে আসতেন।

আর দু'পা এগিয়ে যেতেই গোলক বাগ্দীর সঙ্গে দেখা হ'ল।

ডান হাতের হুঁকোটা আলের মাথায় ঠেস দিয়ে রেখে গোলক সেইখানেই গড় হয়ে প্রণাম করলে।

—ভালো আছেন ছোটবাবু?

গোলককে মহেন্দ্র প্রথমে চিনতেই পারেনি। অসুরের মতো তার গায়ে জোর ছিল। কালো, লম্বা চেহারা। যেমন বুকের ছাতি, তেমনি পরিপুষ্ট কাঁধ এবং ঘাড়, তেমনি গুলি-পাকানো দেহ। কিন্তু তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। শরীরের হাড় গোণা যায়, দেহ নুয়ে পড়েছে। বয়স তার চল্লিশও বোধ হয় হয়নি। কিন্তু দেখলে মনে হয় ষাট, এমন বুড়ো হয়ে গেছে।

—গোলকদাদা? চিনতেই পারিনি তোমাকে? এ রকম চেহারা হ'ল কেন?

—আর ছোটবাবু, চেহারা! ম্যালোয়ারীতে খেয়ে ফেললে।

—বাড়ীর খবর ?

—বাড়ীর তো আর খবর নেই ছোটবাবু। সব ম'রে গেছে।

—ছেলে-মেয়ে ?

—সব ম'রে গেছে। ছা-পোনা কিচ্ছু নেই। কতক দুর্ভিক্ষে, কতক জ্বরে। আমাদের পাড়ায় কত লোক, আর কত হৈ হৈ ছিল মনে পড়ে ? এখন মোটে আমরা দু'জন বেঁচে আছি। তাও জ্বরে ধুঁকছি।

—সব পাড়ার অবস্থাই কি এই রকম ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁতিপাড়া, কুমরপাড়া, সাওপাড়া সব এই অবস্থা। মানুষ দেখতে পাবেন না।

—মুসলমানপাড়া ?

—সবই এক অবস্থা। জ্বর দুর্ভিক্ষের কাছে কি আর জাত আছে ছোটবাবু ?

—তা বটে।

মহেন্দ্রের হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল।

বললে, তোমাদের বাড়ীতে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁচা পেঁয়াজ আর মাছ-পোড়া দিয়ে পান্তা ভাত খেতাম, মনে পড়ে ?

—তা আর মনে পড়বে না ছোটবাবু ? এ তো সেদিনকার কথা। কতই বা আপনার বয়েস ? আমাদের বাড়ীতেই তো আপনি মানুষ।

গোলোকের চোখ ছলছল ক'রে উঠলো।

বাঁ হাতের উলটো পিঠে চোখ মুছে বললে, আপনি এসেছেন শুনে প্রাণটা আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কি রকম ক'রে উঠলো।

মহেন্দ্র সেইখানে আলের উপর ব'সে প'ড়ে বললে, তা এলে না তো কই ? বোসো গোলকদা, ব'সে ব'সে একটু গল্প করা যাক।

গোলক তার পায়ের কাছে জমির উপর বসে বললে, আসতাম ছোটবাবু, কিন্তু সবাই মানা করলে যে।

—মানা করলে ? কেন ?

—সবাই যে বললে,

—কি বললে ?

একটা ঢোঁক গিলে গোলক বললে, আচ্ছা, ছোটবাবু, সত্যি কি আপনি খিষ্টান হয়েছেন ?

এই কথাটা দুপুরে স্নানের পথে তর্কালঙ্কারমশাই একবার জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন। এখন গোলকও জিজ্ঞাসা করলে।

বিরক্তভাবে মহেন্দ্র বললে, না। ক্রিশ্চান হব কোন্ দুঃখে ? এ-কথাটা কে রটাচ্ছে বলো তো ?

মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে গোলক বললে, সবাই বলছে বাবু। কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি। বললাম, ওরে, সে যে আমাদের রাখালের রাজা রে! আমি গেলে দেখা না ক'রে কি পারে? পারো ছোটবাবু? সত্যি বলো।

—কখ্খনো পারি না।

—তাই বলো ছোটবাবু। আজ না হয় তুমি মথুরায় রাজা হয়েছ, হাকিমদের মাথার উপর বসে খানা খাও। কিন্তু আমরা যে তোমার আপন-জন। নয় কিনা বলো ?

—সত্যিই গোলকদাদা। কিন্তু এসে পর্যন্ত কেউ যে আমার সঙ্গে দেখা করছে না, সে কি এই জন্যে ?

—এইজন্যেই তো। আহা! বেণী বাঁড়ুয্যে অন্ধ হয়ে গেছেন। আজ সকালে কী তেনার কান্না! 'চোখে দেখতে পাই না গোলক, আমাকে একবার নিয়ে চল তোদের ছোটবাবুর কাছে।' তা কি কেউ আসতে দিলে ? সবাই বললে, তিনি সাহেব হয়ে গেছে। গেলেই কুকুর লেলিয়ে

দেবে। কানা মানুষ, চোখে দেখ না। শেষে কি বুড়ো বয়সে তালকুম্ভার হাতে প্রাণটা দেবে?

মহেন্দ্র খপ ক'রে গোলকের একখানা হাত চেপে ধ'রে বললে, কাল সকালে তাঁকে একবার তুমি আমার কাছে নিয়ে আসবে গোলকদাদা?

—নিশ্চয় নিয়ে আসব ছোটবাবু।

—আমার গা ছুঁয়ে বলছ তো?

হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে গোলক বললে, গায়ে হাত দিয়ে আর বলতে হবে না ছোটবাবু। কাল সকালে আমি নিশ্চয় তাঁকে নিয়ে আসব।

ব'লে আর একবার গড় হয়ে প্রণাম ক'রে গোলক চলে গেল।

আরও অনেকখানি মাঠে-মাঠে এলোমেলো ঘুরে যখন সে বাগান-বাড়ীতে ফিরলো, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে।

ইব্রাহিম এসে আলো জেলে দিলে। মহেন্দ্র বসবার ঘরে একখানা সোফায় আড় হয়ে ব'সে একখানা বই খুলে বিভূতির প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

কিন্তু বিভূতি এলো না। তৎপরিবর্তে একটি নারীমূর্তির আবির্ভাবে সচকিত হয়ে মহেন্দ্র বললে, কে?

মূর্তি চৌকাঠের ওপর থেকেই গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলে। তারপর মাথার কাপড় সরিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে স্থিরনেত্রে মহেন্দ্রের দিকে চাইলে।

বয়স তার কুড়ির বেশি হবে। পরণে মলিন থান কাপড়। কিন্তু তাতেও রূপ ঢাকা পড়েনি।

মহেন্দ্র বললে, গায়ত্রী? তুমি? এ কি বেশ?

গায়ত্রী জবাব দিলে না। পাশের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে অন্য দিকে চেয়ে তেমনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

শান্তকণ্ঠে মহেন্দ্র বললে, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন গায়ত্রী? ভিতরে এসো।

—না, এই বেশ আছি মহিনদা।

ব'লে চৌকাঠের বাইরে জড়োসড়ো হ'য়ে বসে দূরের দিকে উদ্দেশ ক'রে বললে, তুমি যেন চ'লে যেও না গোলকদা। আমি এখনই তোমার সঙ্গে যাব।

ক্ষুণ্ণকণ্ঠে মহেন্দ্র বললে, ভিতরে এসে বসলে জাত যেত না গায়ত্রী। আমি সত্যি খৃষ্টান হইনি।

গায়ত্রী এবারে হেসে ফেললে।

বললে, সে আমি জানি। কিন্তু তোমার খাওয়া-দাওয়ার বিচারও তো নেই। কিছু মনে কোরো না। আমি এইখানেই বসলাম।

খাওয়া-দাওয়ার বিচার যে মহেন্দ্রের নেই এ তো সত্য কথা। মহেন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। তারপর শান্তকণ্ঠে বললে, কিছু কি বলতে এসেছিলে গায়ত্রী?

—হ্যাঁ। বাবা অন্ধ হয়েছেন শুনেছ তো?

একটু আগে শুনলাম গোলকের কাছে। কাল তিনি হয়তো একবার আসবেন।

—হ্যাঁ, কিন্তু তিনি এলে হবে না বলে আমি নিজেই আজ এলাম।

—বলো।

—তোমার কাছে টাকা আছে? আমাদের বড় কষ্ট।

দু' বৎসর পরে প্রথম সাক্ষাতের দিনে এই গায়ত্রীর কথা! ধাক্কাটা কাটাতে মহেন্দ্রের একটু সময় লাগলো।

বললে, দেখি কি আছে।

শোবার ঘরে সুটকেসটা খোলবার সময় মহেন্দ্রের বুকের ভিতর থেকে আবার একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

খুব বেশী টাকা মহেন্দ্র সঙ্গে আনেনি। খরচ-খরচা বাদ দিয়ে যা আছে তার পরিমাণ খুচরো নিয়ে দুশো টাকার কাছাকাছি হ'তে পারে। সেই মনিব্যাগটি বের ক'রে নিয়ে এসে সে গায়ত্রীর প্রসারিত করতলের উপর আলগোছে ফেলে দিলে।

গায়ত্রী ভয়ে ভয়ে বললে, খুব ভারী মনে হচ্ছে, তুমি বেশি টাকা দিলে না তো?

—না। কিন্তু তুমি আর দেরি কোরো না গায়ত্রী। রাত হয়ে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ। এই যে যাই।

ব'লে চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়ে আর একবার প্রণাম ক'রে গায়ত্রী নিচে নেমে গেল।

পাঁচ

অনেক রাত্রি পর্যন্ত বিছানায় ছটফট ক'রে ভোরের দিকে মহেন্দ্রের নিদ্রা এল। যখন ঘুম ভাঙলো, একটু বেলাই হয়েছে।

হাত-মুখ ধুয়ে চা খেতে খেতে খবরের কাগজে চোখ বুলোচ্ছে, এমন সময় সিঁড়িতে লাঠির খট খট শব্দে এবং গোলকবিহারীর কর্কশ কণ্ঠস্বরে সে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

আগে বেণী বাঁড়ুয্যে, পিছনে গোলক।

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি একখানা কাঠের চেয়ার বের ক'রে দিলে। তারপর প্রণাম ক'রে বললে, প্রণাম করছি কাকাবাবু। পা ছোঁব আপনার?

চেয়ারে শশব্যস্ত হয়ে ব'সে বাঁড়ুয্যেমশাই বললেন, ছোঁবে বই কি বাবা। তুমি ছেলে, পা ছোঁবে না?

মহেন্দ্র পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে আর একখানা চেয়ার টেনে এক পাশে বসলো। রেলিঙের কাছে মেঝের উপর বসলো গোলক।

বেণীমাধব বললেন, বাইরে কোন্ ছেলে যে খাওয়া-দাওয়ার অনাচার করে না তা তো জানি না। তার জন্যে আজকাল আর কেউ সমাজচ্যুতও হয় না, ধর্মচ্যুতও হয় না। নরেন বাবাজি কেন যে গ্রামের বুকের উপর বসিয়ে তোমাকে দিয়ে এই সব অনাচার করাচ্ছেন তিনিই জানেন। কিন্তু কাজটা ভাল হচ্ছে না বাবাজি। সমাজকে বলে দেবতা। তাকে অকারণ অপমান করতে নেই।

মহেন্দ্র বললে, কিন্তু আমি তো বাড়ী ছেড়ে এমন ক'রে এখানে থাকতে চাইনি।

—তাই নাকি? তবে যে শুনলাম,

— কি শুনলেন?

—যে, তুমি নাকি দিশী খাওয়া খেতে পারছ না?

—মিথ্যে কথা। এ সব কারা রটাচ্ছে, কেন রটাচ্ছে তারাই জানে। সুতরাং ও প্রসঙ্গ থাক। কেমন আছেন বলুন।

—আমি? বুড়ো হয়েছি, চোখেও দেখতে পাই না। নইলে ভালোই আছি।

বেণীমাধব হা হা ক'রে হাসতে লাগলেন।

এবারের সংসারযাত্রায় এই সন্তোষই তাঁর একমাত্র মূলধন। বৃত্তিশূন্য যজমানী, জমি-জায়গা নেই বললেই চলে, অনেকগুলি ছেলে মেয়ে—খুব দুঃখেরই সংসার। লোকে তাঁর জন্যে দুঃখ করেছে, কিন্তু তিনি নিজে কোনোদিন করেন নি। কোথাও তার জন্যে মুখ নামিয়েও থাকেন নি। ধনী ও দরিদ্রের মর্যাদা যে এক নয়, বহুবার অপদস্থ এবং লজ্জিত হয়েও তা

তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন না। তিনি সব সময় ভালোই আছেন এবং ভালোই থাকেন।

মহেন্দ্র হেসে বললে, আপনি তো সব সময় ভালোই থাকেন কাকাবাবু।

—থাকব বই কি বাবা। আমার দুঃখটা কি বলো। তবু মাঝে মাঝে ভগবান দুঃখও দেন বই কি! মেয়েটা বিয়ের দু মাসের মধ্যে বিধবা হ'ল, দুঃখ পেলাম বই কি বাবাজি। আবার দেখ, আজকে দুঃখ হচ্ছে চোখ নেই ব'লে। তোমাকে দেখতে ভয়ানক ইচ্ছা হচ্ছে বাবা!

বৃদ্ধের শুষ্ক চোখের কোণ বয়ে এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। গোলকও নিঃশব্দে মলিন কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছলো।

একটুক্ষণ নিঃশব্দে ব'সে থেকে বেণীমাধব বললেন, আজ তাহ'লে উঠি বাবাজি। আর একদিন এসে অনেকক্ষণ ধ'রে যুদ্ধের গল্প শুনব। গোলকবিহারী, চল বাবা।

লাঠিটায় ভর দিয়ে উঠতে গিয়েই গোলক আবার ব'সে পড়লো।

বললে, যে জন্যে আসা সেই কথাটাই যে বললেন না খুড়োঠাকুর।

বিস্মিতভাবে বেণীমাধব জিজ্ঞাসা করলেন, কি কথা বল্ তো?

—সেই যে দিদিমণি ব'লে দিলে।

—ও হো!

বেণীমাধব আবার বসলেন। বললেন, তুমি এখন দিনকয়েক আছ তো বাবাজি?

—তা আছি।

—তাহ'লে কাল একবার আমাদের বাড়ীতে দুটো শাক-ভাত খেতে যাবার সুবিধে হবে? এই ধরো দুপুরের দিকে?

—কিন্তু তাতে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না তো?

—ক্ষতি? কিছুমাত্র না।

মহেন্দ্র বুঝলে, ইঙ্গিতটা বৃদ্ধ ঠিক ধরতে পারলেন না। তাই পরিষ্কার ক'রে বললে, সমাজে কোনো গোলযোগ হবে না তো?

—না, না, বাবা। তা হবে কেন? তা হ'লে তোমার অসম্মান করবার জন্যে আমি কি তোমাকে খেতে বলতে পারি?

—তাহ'লে যাব কাল দুপুরে।

একটুক্ষণ চিন্তা ক'রে বৃদ্ধ বললেন, আমি ছেলেদের কাউকে পাঠিয়ে দোব বরং।

—কিছু দরকার নেই কাকাবাবু। আপনার বাড়ীর রাস্তা তো আমি ভুলে যাইনি। নিজেই যেতে পারব।

বৃদ্ধ হা হা করে হেসে বললে, বেশ বাবা, বেশ।

এবং আর এক প্রস্থ আশীর্ব্বাদ করে লাঠির শব্দ করতে করতে প্রস্থান করলেন।

বেণীমাধব চলে যাওয়ার একটু পরেই ব্যস্তভাবে নরেন এল।

—তুমি কালকে একাই নদীর ধারে বেড়াতে বেরিয়েছিলে বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ভালো করোনি। কেন, দারোয়ানরা কি কেউ ছিল না?

—ছিল বোধ হয়। কিন্তু একলা বেড়াতে ভয়টা কি দাদা?

—ভয় অনেক। এই হতভাগা গাঁয়ের অবস্থা তুমি জানো না। এরা সবাই আমাদের হিংসা করে। সুযোগ পেলে অনেকেই আমাদের শত্রুতা করতে ছাড়বে না। এদের সবাই কোনো-না-কোনো ভাবে আমাদেরই খাচ্ছে পরছে অথচ সুবিধা পেলে আমাদেরই সর্বনাশ করবে। এত বড় বজ্জাত, হারামজাদা এরা। তুমি অনেক দিন গ্রামছাড়া, এদের খবর তো ঠিক রাখো না।

নরেন নিঃশ্বাস নেবার জন্যে থামলে।

মহেন্দ্র শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, এরা আমাদের হিংসা করে কেন?

—কেন? তার অনেক কারণ আছে। প্রধান কারণ, আমাদের টাকা আছে।

—টাকা তো আমাদের অনেক দিন থেকেই আছে।

—তা আছে। কিন্তু কি জানো সম্প্রতি পাঁচ রকম ব্যবসায় আরও দু'পয়সা হয়েছে তো। সেই জন্যে। যাকগে, সে কিছু নয়। শকুনের শাপে কিছু আর গরু মরে না। তবু রাত-বিরেতে একলা না বেরুনোই ভালো বুঝলে না?

নরেন চ'লে গেল।

মহেন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, ক'টি প্রশ্ন করে: চোরাবাজারের প্রশ্ন, আর সাহেব সাজিয়ে তাকে বাগান-বাড়িতে রাখার হেতু। কিন্তু সঙ্কোচবশে জিজ্ঞাসা করতে পারলে না। নরেনের সম্বন্ধে একটি বিষয়ে সে নিঃসংশয় ছিল। সে হচ্ছে তার উপর দাদার স্নেহ। এই স্নেহ সর্বত্র হয়তো খুব বলিষ্ঠ নয়। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো নারীর মতো কোমল, অত্যাচারের মতোই বাজে। তবু তার অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? তার একটি চোখ সমস্ত কাজের মধ্যেও যে তারই দিকে নিবদ্ধ রয়েছে তার প্রমাণ তো এখনই পাওয়া গেল।

মহেন্দ্র জামাটা গায়ে দিয়ে বাড়ীর দিকে বার হোল। সদর দিয়ে যাওয়ার অনেক ঝামেলা। আবার হয়তো দাদার সামনে পড়বে এবং সতর্কতা ও গ্রামের দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ শুনতে হবে। স্থির করলে খিড়কি দিয়ে যাবে। সে সোজা রাস্তা ধরলে।

বাগানবাড়ী পেরিয়েই আমবাগান। তার পরে বাঁশবন এবং মিত্তিরের পচা ডোবার ধার দিয়ে একটু গেলেই তাদের খিড়কি। চোখে পড়লে বাঁশ বনের ফাঁক দিয়ে বেণীমাধবের খড়ের চালের কিয়দংশ।

মনে পড়লো কেশীমাধবকে :

সরল সেকেলে ব্রাহ্মণ।

গত কাল গায়ত্রীর তার কাছে আসা সম্বন্ধে একটি কথাও ভদ্রলোক বললেন না। নিশ্চয়ই জানেন না। জানলে তাঁর পেটের মধ্যে কথা বেশিক্ষণ টিকত না। মহেন্দ্র তার জন্যে আশ্বস্ত বোধ করলে।

হঠাৎ তার চোখ পড়লো পচা ডোবার ঘাটের দিকে। গায়ত্রী বাসন-মাজা বন্ধ রেখে তারই দিকে চেয়ে আছে। মহেন্দ্রের চোখে চোখ পড়তেই তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে বাসন মাজতে বসলো।

মহেন্দ্রের একবার লোভ হ'ল একটি ছোট ঢিল কুড়িয়ে তার পিঠের উপর ছুঁড়ে মারে। কিন্তু তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে চ'লে গেল।

ওদের নিজেদেরও খিড়কির ঘাটে ঝিয়েরা বাসন মাজছিল। হঠাৎ খিড়কির পথে ছোটবাবুকে আসতে দেখে তারাও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। মহেন্দ্র সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না ক'রে সোজা ভাঁড়ারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

—বৌদির গলা যেন এইদিক থেকেই আসছিল?

—ঠিকই ধরেছ ভাই! তুমি একটু উপরে বোসো, আমি আসছি।

মিনিট দশেক পরে স্বর্ণ চা আর খাবার নিয়ে উপরে এল।

মহেন্দ্র বললে, ও কি বৌদি? তুমি কি জানো না, সাহেবরা যখন-তখন, যেখানে-সেখানে চা খাবার খায় না?

স্বর্ণ মেঝের উপর চায়ের প্লেটটা নামাতে যাচ্ছিল। থমকে দাঁড়িয়ে বললে, তাই নাকি?

মহেন্দ্র হাত বাড়িয়ে প্লেটটা নিয়ে গম্ভীরভাবে বললে, তাই। অবশ্য আমার মতো সাহেবে খায়, কিন্তু আসল সাহেবে খায় না।

— তবে আর চিন্তা কি?—ব'লে স্বর্ণ খাবারের প্লেটটা নামিয়ে দিলে।

মহেন্দ্র বললে, তোমাকে কতকগুলো নতুন রান্না শিখিয়ে দোব ব'লে-ছিলাম। বলো তো, আজই তোমার হাতে-খড়ি···

সুবর্ণর মুখে একটা কালো ছায়া পড়লো।

বললে, আজ নয় ভাই। আজ আমার একেবারেই ফুরসুৎ নেই। কাল মায়ের একাদশী গেছে। আজ দ্বাদশী। এতক্ষণ সেই ব্যাপারেই ব্যস্ত ছিলাম। এখন স্নান ক'রে এসে মায়ের হবিষ্যি চড়াব। আজ আর আঁশের রান্নাঘরে ঢুকতেই পাব না।

ওর গিঁটবাধা এলোচুলের দিকে চেয়ে মহেন্দ্র বললে, কিন্তু স্নান যেন একবার ক'রেছ মনে হচ্ছে।

—তবু আবার একবার করতে হবে।

—কেন? আমি ছুঁয়ে ফেললাম ব'লে? তাহ'লে তো ভারি অন্যায় হ'ল।

লজ্জিতভাবে সুবর্ণ বললে, শুধু সেইজন্যেই নয় ঠাকুরপো। একবার স্নান ক'রে এসে মায়ের দ্বাদশীর উজ্জুগ করলাম। তারপর ঝি-চাকর ছোঁয়া কত কি তো করলাম। আর একবার স্নান না করলে ওঁর হবিষ্যি চড়াতে ইচ্ছে হবে না।

এ কৈফিয়ৎ মহেন্দ্র ঠিক বিশ্বাস করলে কি না বোঝা গেল না। সে নিঃশব্দে প্লেটের খাবার এবং চা নিঃশেষ করলে।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, দ্বাদশী থাকবে না এমন একটা দিন স্থির ক'রে আমাকে জানিও। সেইদিন এসে তোমাকে রান্না শিখিয়ে দিয়ে যাব। আজ উঠি।

সুবর্ণ সিঁড়ির কাছ পর্যন্ত পিছু পিছু এসে কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি রাগ ক'রে যাচ্ছ না তো ঠাকুর পো?

—না, না। রাগ ক'রে যাচ্ছি না। কিন্তু তোমাকে সত্যি কথাই বলি, জিনিসটা কেমন যেন ভালো লাগছে না।

—কে, বৌমা? কার সঙ্গে কথা বলছ?—তেতলা থেকে বিরাজ মোহিনীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

স্বর্ণ বললে, ঠাকুরপো এসেছে।

বিরাজমোহিনী নেমে এসে বললে, মহীন? এখনই চলে যাচ্ছিস? বসবি না?

মহেন্দ্র অভিমান ভরে বললে, ব'সে আর কি করব মা? খেতে তো আর দেবে না।

এক গাল হেসে বিরাজমোহিনী বললেন, শোনো পাগলা ছেলের কথা বৌমা! তুই কত বড় লোক হয়ে ফিরেছিস। নরেন বলে, এ জেলায় তোর সমান লোক নাকি নেই। জজ-মেজিষ্টর সকলের ওপরে তুই! তাই নিয়ে নরেনের কত গর্ব! তুই খাবি এবাড়ীর ডাল-ভাত?

বার বার সেই এক কথায় মহেন্দ্র ক্রমেই চ'টে যাচ্ছিল। বললে, ওসব বাজে কথা মা, একেবারে বাজে কথা। কিন্তু কবে আমি তোমাদের বলেছি যে, আমি এবাড়ীতে থাকব না, মা-বৌদির হাতে খাব না, আমি সাহেব হয়েছি, ইব্রাহিমের হাতে খানা খাব আর বাগান বাড়ীতে থাকব? কবে বলেছি বলো?

শান্তকণ্ঠে বিরাজমোহিনী বললেন, তুই বলবি কেন বাবা। সংসারে যে তোকে সব চেয়ে ভালোবাসে এব্যবস্থা সেই করেছে। সেই তোকে গাঁয়ের মাথার ওপরে সাহেব ক'রে সাজিয়ে রেখেছে। সেই তোকে খেতে দেবে না ডাল-ভাত। তুই বললেও না।

এর পরে মহেন্দ্র আর কি বলতে পারে? নিজের দাদাকে সেও তো ভাল ক'রেই চেনে। মায়ের কথা মনে-মনেও মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেওয়ার সাধ্য তার নেই।

আর কোনো কথা না ব'লে ধীরে ধীরে সে বেরিয়ে গেল। মনে হ'ল, আসার সময় যে অস্বস্তি তার মনের মধ্যে জমেছিল, মায়ের কথায় তার

সমস্তটুকুই উড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল। মনের মধ্যে একটা গম্ভীর তৃপ্তির ভাব নিয়েই সে বাগানবাড়ীতে ফিরে এল।

ছয়

বেণীমাধবের বাড়ীর অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়।

ভিতরের দিকে উঁচু-দাওয়াওলা এক-কুঠুরী একখানা ঘর। চালের খড় একেবারে পাংলা ধূসর হয়ে গেছে। বাখারীগুলো স্থানে স্থানে নরকঙ্কালের মতো অনাবৃত। বোঝা যায়, খড়ের অভাবে কয়েক বৎসরই ছাওয়ানো হয়নি। সামনে সদরের দিকে একটি চালা। ঘেরা নয়। তার বাইরের রাস্তার দিকের অংশ বৈঠকখানা হিসাবে এবং ভিতরের অংশ রান্নাঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মধ্যে সংকীর্ণ একফালি উঠান। তারও আধখানায় গায়ত্রী কিছু শাক, কাঁচা লঙ্কা এবং বেগুনের গাছ লাগিয়েছে।

যতদিন দৃষ্টিশক্তি ছিল, বেণীমাধব সংসারের কাজকর্ম নিজেই করতেন। এখন আর পারেন না, করেনও না। অধিকাংশ সময় এখন সদরের চালায় বসে তামাক খান, লোকজনের সাড়া পেলে তাদের ডেকে বসিয়ে ছুটো গল্প করেন এবং গ্রামের খবরাখবরও পান। দরিদ্র সংসারের ফুটো নৌকা কি ক'রে যে চলছে, সে খবর তিনি রাখেন না, রাখা প্রয়োজনও মনে করেন না। অসহ্য হ'লে গৃহিণী মাঝে মাঝে চীৎকার ক'রে জানাতে চান, কিন্তু গায়ত্রী মুখ চেপে ধরে।

বলে, কী হবে মা শুনিয়ে? উনি তো কোনো সাহায্যই করতে পারবেন না। শুধু মনে কষ্ট পাবেন।

নিজের সংসার সম্বন্ধে বেণীমাধবের কোনো কৌতূহল না থাকলেও পাড়া-প্রতিবেশীদের কৌতূহলের অভাব ছিল না। কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও তারা এই সংসার চলার রহস্য উদ্ধার করতে পারেনি।

মাত্র ছু'টি বড় ছেলে বাইরে সামান্য কি চাকরী করে। নিজেরা খেয়ে-

প'রে যা সামান্য কিছু তারা পাঠাতে পারে, তাতে দুন-ভাত বাজারে মাসে দশটা দিনের বেশি চলবার কথা নয়। অথচ দুন-ভাত কি শাকভাত তা জানলেও এ তো সবাই দেখতে পাচ্ছে যে, দিন চ'লে যাচ্ছে। প্রতিবেশীর কাছে ওদের কেউ কখনো একটি পয়সা, কি এক মুঠো চাল, কি একটা বেগুন ধার করতেও যায়না।

কি ক'রে এমন সম্ভব হয়?

প্রতিবেশিনীরা মাঝে মাঝেই আসে। সহানুভূতির সঙ্গে গায়ত্রীর গুণগান ক'রে বলে, সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মীকে গর্ভে ধরেছিলে পতুর মা। এমন মেয়ে হয় না। ওইটুকু মেয়ে কি ক'রে যে এই সংসার চালাচ্ছে কাক-পক্ষীতে জানতে পারে না। অমন মেয়েরও কপাল পোড়ে? পোড়া বিধেতার কি চোখ নেই গা?

বিধাতা চিরকালই শান্তিপ্রিয়। অতি বড় মিথ্যা অভিযোগেরও তিনি কখনও প্রতিবাদ করেন না! এতেও চুপ ক'রেই থাকেন। এমন কি যার পক্ষ হয়ে প্রতিবেশিণী এই মন্তব্য করে সেও, নীরব থাকে। কোনো দিকে সাড়া না পেয়ে তারা হতাশভাবে চ'লে যায়। রহস্যের কোনো কিনারা হয় না।

বস্তুতঃ ব্যাপারটায় রহস্যও কিছু নাই। সে কথা জানে একমাত্র গোলকবিহারী।

বিধবা মেয়ের জন্য মাও রাত্রে কিছু আহার করেন না। দিনেও অর্ধেক মাসই তাঁদের দুজনকে অভুক্ত থাকতে হয়। এবাড়ীর ছেলে-মেয়েরাও এমনই শান্ত যে, আহার জুটুক, না জুটুক তারা কোলাহল করে না। এই বয়সেই দুর্ভাগ্যকে আত্মমর্যাদার সঙ্গে নিঃশব্দে মেনে নেবার শিক্ষা তাদের হয়েছে।

কিন্তু মহেন্দ্রের খাবার দিন বেণীমাধবের নির্বিকার ভাব আর রইলো না।

—ছেলেটা খাবে এখানে। কিন্তু নিতান্তই শাক-ভাত খাওয়াবি গায়ত্রী?

গায়ত্রী বললে, তাছাড়া আর কি খাওয়াব বাবা? আর কী খাওয়াতেই বা আমরা পারি?

—তা ঠিক।

বেণীমাধব অনেকদিন পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নিজের দারিদ্র্য-জনিত অক্ষমতার জন্যে। মহেন্দ্রকে সত্যই তিনি ভালোবাসেন। তাকে ভালো ক'রে খাওয়াতে পারলে তিনি আনন্দ বোধ করতেন।

গায়ত্রী বললে, তিনি তো পর নন বাবা। এতে দুঃখ করবার কি আছে?

—তা বটে।

বললেন বটে, কিন্তু বেণীমাধবের বুকের উপর ক্ষোভের পাথরটা তেমনি চেপে ব'সেই রইল।

গোলক বললে, আপনি বাইরে গিয়ে বোসো গে না ঠাকুরমশাই। আমরা দুই ভাই-বোনে যা পারি তাই করব। কি বলো দিদিমণি।

গোলকের কথা শুনে বেণীমাধব খানিকটা আশ্বস্ত হ'লেন। বললেন, তাই যা হয় কর বাবা, আমি আর মিথ্যে ভাবতে পারি না।

ব'লে ঠুক ঠুক ক'রে বাইরের দাওয়ায় গিয়ে বসলেন।

একটু পরেই তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা গেল; আমাকে একটু তামাক দিও গোলক।

মহেন্দ্র এল তখন একটা।

তার গায়ে সাধারণ একটা গেঞ্জি। পরণে সাদাসিধে একখানি ধুতি লুঙ্গির উপর মালকোঁচা দিয়ে বাঁধা। এই গ্রামে ছেলেবেলায় যে-বেশে ডাংগুলি খেলতো আর আম পেড়ে বেড়াত।

পোষাক দেখে গায়ত্রী না ব'লে পারলে না : এ কী ! সাহেবের এ কি বেশ !

মহেন্দ্র জবাব দিলে না। শুধু হেসে বললে, রান্নার কত দেরি বল ? ক্ষিদেয় নাড়ী চুঁই চুঁই করছে।

হেসে গায়ত্রী বললে, দেরি নেই। জায়গা ক'রে দিচ্ছি।

বড় ঘরের দাওয়ায় আসন পেতে গায়ত্রী জায়গা ক'রে দিলে। আগুট-কলাপাতা ধুয়ে পেতে দিলে। তার মধ্যে পরিপাটি ক'রে সাজিয়ে দিলে ভাত। পাশে পাশে নানা রকমের তরকারী এবং মাছ।

আয়োজন দেখে মহেন্দ্র বললে, ভারি ভুল হয়ে গেল গায়ত্রী।

—কি আবার ভুল হ'ল ?

মহেন্দ্র বললে, ভেবেছিলাম নিতান্তই শাক-ভাত খাওয়াবে, ধুতি আর গেঞ্জিই যথেষ্ট। এ রকম জানলে আরও ভালো পোষাক ক'রে আসতাম।

মহেন্দ্র হাসতে লাগলো।

—তার আর উপায় নেই। তুমি ব'সে পড় বরং।

—সেই ভালো। —ব'লে মহেন্দ্র খেতে বসলো।

গায়ত্রী বললে, কলাপাতায় খেতে বোধ হয় তোমার অসুবিধা হবে মহিনদা।

—হলেই বা করব কি বলো ? ব্রাহ্মণের বাড়ী খৃষ্টানের নিমন্ত্রণ। থালায় তো আর দেওয়া যায় না।

গায়ত্রীর মুখ বেদনায় বিবর্ণ হয়ে উঠলো।

বললে, সেজন্যে নয় মহিনদা।

—তবে ?

গায়ত্রী আস্তে আস্তে বললে, কাঁসার থালা আর আমাদের একখানিও নেই। একে একে সবই বাঁধা গেছে।

মহেন্দ্র চমকে উঠলো। না জেনে একটা সাধারণ পরিহাস ক'রে ফেলে তার লজ্জার আর শেষ রইল না। কি বলবে ভেবে না পেয়ে মুখ নামিয়ে নিঃশব্দে খেতে লাগলো।

—ভাতের মধ্যেখানটা একটু গর্ত কর মহিনদা। ডাল দোব।

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি পাতে খানিকটা গর্ত ক'রে বললে, এই যে, এইখানে দাও। অল্প একটু দিও।

এ রকম পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার মহেন্দ্র অনেক দিন করেনি।

তার উপর না জেনে গায়ত্রীকে যে লজ্জা দিয়েছে তার ক্ষতিপূরণ করতে অনেক কিছু তাকে চেয়ে নিয়েও খেতে হ'ল।

ওঠবার সময় বললে, খাওয়াটা বড় বেশি হয়ে গেল গায়ত্রী।

—কেন খেলে? শরীর খারাপ করবে না তো?

—শরীর আমার খারাপ করবার নয়। সে ভয় করছি না। তবে—

—একটা মাদুর বিছিয়ে দোব? একটু গড়িয়ে নেবে?

—তাই দাও বরং। একটু গড়াতেই হবে বোধ হচ্ছে।

গায়ত্রী বড় ঘরের মেঝেয় পরিপাটি ক'রে একখানা মাদুর বিছিয়ে দিলে। নিজের বাক্স থেকে একখানা ফরসা তোয়ালে বার ক'রে বালিশের উপর পেতে দিলে।

মহেন্দ্র বললে, তুমি খেয়ে এসো। আমি ততক্ষণ একটু গড়াই।

ব'লে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলো।

অনেকক্ষণ পরে গায়ত্রী এসে দোরগোড়ায় বসলো।

বললে, কিছু যুদ্ধের গল্প বল মহিনদা।

—যুদ্ধের গল্প তো বলা যায় না গায়ত্রী। যুদ্ধ আর দারিদ্র্য, এর সত্যিকার গল্প হয় না।

—কেন হয় না?

—কারণ জিনিসটা অত্যন্ত বেশি বাস্তব। ওর ঠিক রূপ দেওয়া কঠিন। তবে এটা ঠিক যে, তোমরা যুদ্ধকে যত ভয়াবহ মনে কর, তত নয়। তা যদি হ'ত, তাহ'লে লক্ষ লক্ষ লোক বছরের পর বছর পৈশাচিক আনন্দে যুদ্ধ করতে পারতো না।

—তুমি কখনও মানুষ কেটেছ?

—কেটেছি, কিন্তু তরোয়াল দিয়ে নয়, ছুরি দিয়ে। আমি তো মানুষ মারবার জন্যে যাইনি গায়ত্রী, মানুষ বাঁচাবার জন্যে গিয়েছিলাম। কাটা-কুটির মধ্যে আহতদের উপর অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে।

—ভালো লাগতো?

—ভালো-লাগা মন্দ-লাগার প্রশ্নই সেখানে ওঠে না। যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ ঠিক যন্ত্র হয়ে যায়। ট্যাঙ্কের যেমন ভালো-লাগা মন্দ-লাগার বালাই নেই, যোদ্ধারও তেমনি নেই। সে এক আশ্চর্য অনুভূতি। ঠিক বোঝানো যায় না। স্নেহ নেই, দয়া নেই, ক্রোধ নেই, হিংসা নেই,—যে সমস্ত প্রবৃত্তি মানুষকে ক্রমাগত এঞ্জিনের মতো ঠেলে সাধারণতঃ সক্রিয় ক'রে রাখে, তার কোনোটাই নেই। অথচ সক্রিয়তা শতগুণে বেড়ে উঠেছে : এ এক আশ্চর্য অবস্থা নয় কি?

একটু থেমে মহেন্দ্র বলতে লাগলো :

—সেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ছ'বছর পরে আমি ফিরে আসছি গায়ত্রী। স্নেহ ভালোবাসার ক্ষুধা আমার মনে দ্বিগুণ জলছে। অথচ দেখছি, আমার আত্মীয়-স্বজনেরা, আমার বাল্যবন্ধুরা, আমার গ্রামের লোকেরা আমাকে এড়িয়ে চলেছে। কত কষ্ট হচ্ছে বলো তো?

গায়ত্রী একটুক্ষণ চুপ ক'রে কি যেন ভাবলে। তারপর বললে, একটা বিশেষ কথা বলব ব'লেই তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছি। নইলে নিমন্ত্রণ আর কি? তোমারই টাকায় তোমাকে খাওয়ানো।

গায়ত্রী হাসলো।

মহেন্দ্র বললে, কি বিশেষ কথা?

গায়ত্রী বললে, আমি মেয়েমানুষ। সব কথা জানি না। বাকিটা তোমাকেই কষ্ট ক'রে জেনে নিতে হবে।

অসহিষ্ণুভাবে মহেন্দ্র বললে, সে জেনে নোব পরে। তুমি আসল কথাটা কি তাই আগে বলো।

একটু ইতস্ততঃ করে বললে, তুমি এখানে আর থেকো না।

—কেন?

—আমি শুনেছি,

—কি শুনেছ?

—জ্যাঠামশাই না কি কি-একটা উইল ক'রে গেছেন।

—জ্যাঠামশাই মানে আমার বাবা?

—হ্যাঁ।

—তার পরে?

—তাতে নাকি তিনি এই কথা লিখে গেছেন যে, তুমি যদি জীবিত ফেরো এবং স্বধর্মনিষ্ঠ থাকো তাহ'লেই তুমি সম্পত্তির অংশ পাবে, নইলে নয়।

গায়ত্রী বললে, বাগান-বাড়ীতে রেখে নরেনদা তোমাকে দিয়ে প্রকাশ্যে যে অনাচার করাচ্ছেন, সেটা আমার কেমন ভালো লাগছে না। হয়তো মেয়ে মানুষের পাপ মন বলেই,

—খুব সম্ভবত তাই গায়ত্রী। দাদা আমাকে ছলে-ছুতায় ফাঁকি দিতে পারেন, এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না।

—তাই হোক মহিন্দা, এ যেন মিথ্যেই হয়। তবু তুমি একটু খোঁজ নিও।

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললে, না, না। সে আমি পারব না।

নিজের দাদার সম্বন্ধে অন্যের কাছে খবর নোব, সম্পত্তির এত লোভ আমার নেই। আজ আমি উঠলাম গায়ত্রী।

—আর একটু বোসো। আমি এখনই আসছি।

একটু পরেই ফিরে এসে গায়ত্রী বললে, তুমি অনেক বেশি টাকা দিয়েছিলে মহিন দা। এত টাকার দরকার ছিল না। এগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

মহেন্দ্র সেদিকে চাইলেও না।

বললে, তোমাদের দরকার না থাকতে পারে গায়ত্রী, কিন্তু আমার আছে। যাওয়ার আগে তোমার হাতের চমৎকার রান্না আর একদিন খাওয়ার ইচ্ছে রয়েছে, এবং সেদিন কাঁসার থালায় বাটির পর বাটি সাজিয়ে খাব। বুঝলে?

ব'লে চ'লে গেল। গায়ত্রীকে আপত্তি জানাবার অবকাশই দিলে না।

সাত

রাত্রে আহারান্তে নিচের বিছানায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে ব'সে নরেন গড়গড়া টানছিল। সামনে কতকগুলো কাগজপত্র প'ড়ে। সমস্তটা দিন আজ সে ব্যাঙ্কের বাড়ীটা মেরামত করা নিয়েই ব্যস্ত ছিল। দিন আর বেশি নেই। এরই মধ্যে সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ ক'রে ফেলা সহজ কাজ নয়। ব্যাঙ্কের কতকগুলো আসবাবপত্রের জন্যে কলকাতায় লোক গেছে। সে এখনো ফিরলো না কেন, তাও এক চিন্তার বিষয়। আজ রাত্রের ট্রেনে না এলে, কাল তাকে টেলিগ্রাম করার দরকার হবে। এর পর তাকে একবার সদরে যেতে হবে, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সাহেব, সরকারী উকিল প্রভৃতির সঙ্গে উদ্বোধন সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্যে। সেখান থেকে

সোজা তাকে যেতে হবে ক'লকাতায়। সেখানে নিমন্ত্রণপত্র ছাপানো আছে, কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীকে নিমন্ত্রণ করা আছে এবং আরও কত যে কাজ আছে তা ব'লে শেষ করবার নয়। এর সঙ্গে তার নিত্যকার কাজ আছে; সেও অনেক। অথচ মাঝে আর পোনেরোটা দিনও নেই।

কতকগুলো জরুরী বিল সে চেক করছিল। এমন সময় স্বর্ণলেখা এসে তার সামনে পানের ডিবেটি খুলে ধরলে।

তা থেকে একটি পান নিয়ে নরেন আবার হিসাবে মন দিলে।

স্বর্ণ জিজ্ঞাসা করলে, এবার তাহ'লে 'রায়বাহাদুর' না হ'য়ে আর ছাড়ছ না?

নরেন হেসে বললে, সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। আমাদের উকিল জানাচ্ছেন, ম্যাজিষ্ট্রেট এসম্বন্ধে তাঁকে এক রকম পাকা কথাই দিয়েছেন।

—আবার গেল বারের মতো ভেস্তে যাবে না তো?

নরেনের মুখ মলিন হ'ল। গেলবারে ব্যাপারটা সে এমন জানাজানি ক'রে ফেলেছিল যে, উপাধির তালিকার নাম না দেখে লজ্জায় তিন দিন বাইরে বার হ'তে পারেনি।

বললে, কি জানি। তবে যাবে না ব'লেই বিশ্বাস। এ ম্যাজিষ্ট্রেট খাস বিলিতি। মিথ্যে আশ্বাস দেবার লোক নন।

সাহেব জাতের উপর নরেনের আবাল্য গভীর বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা!

বিলিতি সাহেবের কথায় স্বর্ণর ঘরের দিশি সাহেবটির কথা মনে পড়লো।

বললে, ভালো কথা এর মধ্যে ঠাকুরপোর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

হিসাবের খাতা থেকে মুখ তুলে নরেন সবিস্ময়ে বললে, না, কেন বলো তো?

—সাহেবের মেজাজ যেন গরম গরম ঠেকছে।

—কেন বলো তো? তার যত্নের কোনো ত্রুটি হচ্ছে বোধ হয়। কাজের ভিড়ে আমি এ ক'দিন আর ওদিকে যাবার সময় পাইনি। না, না। ওর দিকে তুমি নিজে লক্ষ্য রাখবে। ভারি অভিমানী ছেলে। কোনো অসুবিধা যেন না হয়।

—সেদিকে আমার লক্ষ্য আছে মশাই। কিন্তু সে সব নয়।

—তবে?

—ওর মনে বোধ হয় সন্দেহ হয়েছে, সমুদ্র পার হয়েছিল ব'লেই ছলে-ছুতোয় আমরা ওকে বাইরে রেখেছি। বাড়ীতে জায়গা দিইনি।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

চিন্তিতমুখে নরেন কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ব'সে রইল। তারপর বললে, ভায়ার এখানে যা হিতৈষীর ভিড়! সন্দেহ আসা বিচিত্র কিছু নয়। কালই গিয়ে ওকে তোয়াজ ক'রে আসতে হবে।

দৃঢ়কণ্ঠে স্বর্ণ বললে, না।

—কি না?

—তোয়াজ করতে যেতে পাবে না।

—কেন?

—কিসের জন্যে তোয়াজ করবে? আমরা তো অন্যায় কিছু করিনি। ঠাকুরপো কালাপানি পার হয়েছিল, খাদ্যাখাদ্যের বিচার নেই, সে তো সত্যি কথা। বাড়ীতে আমাদের রাধাবল্লভের নিত্যভোগ। কী ক'রে আমরা তাকে বাড়ীতে জায়গা দিই? এ কি অন্যায় আবদার!

—বাড়ীতে জায়গা তো দিইই নি। আবদারও সে কিছু করেনি। কিন্তু বাবা আজকে বেঁচে নেই। নিজের বাড়ী থেকে সে যদি দুঃখ পেয়ে চ'লে যায়, সে কি ভালো হবে?

—দুঃখ যদি পায় নিজের দোষেই পাবে। সে দায়িত্ব আমাদের নয়।

নরেন হেসে বললে, নয় মানি। কিন্তু ভায়ে-ভায়ে সম্পর্ক তো কেবল দায়িত্ব আর কর্তব্যের নয়, হৃদয় ব'লে একটা বস্তু আছে যে! তাদের যে নাড়িতে-নাড়িতে যোগ। কিন্তু তুমি আর রাত্রি জেগো না বড় বৌ আমার এগুলো শেষ ক'রে উঠতে অনেক রাত্রি হবে। তুমি শুয়ে পড় গে।

সুবর্ণ উঠলো না। আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে সেইখানে ব'সে রইল।

তারপর বললে, ঠাকুরপোর উপর আমারও যে স্নেহ নেই সেকথা ভেবো না। কিন্তু কারও কাছে তুমি মাথা নোয়াবে, কারও সেবার জন্যে তুমি ব্যস্ত হয়ে উঠবে, এ আমি সইতে পারি না।

নরেন হেসে বললে, কারও জন্যে তো নয় বড় বৌ, ভায়ের জন্যে। এটা

সুবর্ণ চুপ ক'রে রইল।

তার পর বললে, তুমি যে বলছিলে অনেক হিতৈষীর ভিড় হয়েছে সেকথা মিথ্যে নয়। বেণী বাঁড়ুয্যের বাড়ীতে সাহেবের যে সেদিন নিমন্ত্রণ ছিল, শুনেছ?

নরেন চমকে উঠে বললে, তাই নাকি? শুনিনি তো।

—হয়েছিল। নিজেদের তো শুনিছি দুবেলা নুন-ভাত জোটে না! অথচ খাবার আয়োজন হয়েছিল নাকি গুরুতর।

নরেন নিঃশব্দে শুনে যেতে লাগলো।

—খাইয়ে-দাইয়েও গায়ত্রী নাকি তাকে ছেড়ে দেয়নি। সারা দুপুরটা সাহেব সেইখানেই শুয়ে কাটিয়েছে। বিকেলে রোদ পড়লে ফিরেছে।

সুবর্ণ হাসতে লাগলো।

বললে, আচ্ছা ঠাকুরপোর তো হিঁদুয়ানীর বালাই নেই। বিধবা-বিবাহও তো এখন চলছে, না?

নরেন বিব্রতভাবে উঠে পড়লো। বললে, রাত অনেক হ'ল বড় বৌ। ঘুম পাচ্ছে ভয়ানক। আলোটা নিবিয়ে দাও।

ব'লে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লো।

সকালে উঠেই নরেন সর্বাগ্রে বাগানবাড়ী গেল।

ইব্রাহিম নিচে মহেন্দ্রের ছোট হাজরীর ব্যবস্থা করছিলো।

নরেন জিজ্ঞাসা করলে, সাহেব উঠেছেন?

—না হুজুর।

—এখনও ওঠেননি? সকালেই তো ওঠেন শুনেছি।

অন্যদিন তাই ওঠেন বাবু। কিন্তু কাল সারারাত তাঁর ঘুম হয়নি।

—ঘুম হয়নি কেন?

—তা জানিনে বাবু। দারোয়ান বলছিলো, কাল সারারাত সাহেব একবার ঘর একবার বারান্দা ক'রেছেন।

—সন্ধ্যেবেলায় কেউ কি এসেছিলেন?

—না হুজুর।

—শরীর ভালো আছে তো? রাত্রে খেয়েছিলেন?

—খেয়েছিলেন বই কি।

নরেন্দ্র চলে গেল, এবং আবার ঘণ্টা দেড়েক পরে ফিরে এল। ইব্রাহিম জানালে সাহেব ছোট হাজরি খেয়ে ওদিকের বারান্দায় বই পড়ছেন।

ওদিকের বারান্দায় যেতেই মহেন্দ্র সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল।

নরেন বললে, কাল রাত্রে তোমার কি ভাল ঘুম হয়নি? আমি আর একবার এসে ফিরে গেছি। শরীর ভাল আছে তো?

মহেন্দ্র ঘাড় নেড়ে জানালে, আছে।

নরেন বললে, অনেক দিন এদিকে আসতে পারিনি, সেই ব্যাঙ্কের ব্যাপারে। তারও তো আর দিন নেই। দু'এক দিনের মধ্যেই একবার সদরে যেতে হবে। সেখান থেকে ক'লকাতায়। এই তো অবস্থা। আজ ব্যাঙ্ক ব'লেই নয়, বারো মাস ত্রিশদিন এই একই অবস্থা। না সময়ে নাওয়া-খাওয়া, না বিশ্রাম।

—শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখবেন।

—রাখি কি ক'রে বলো? এমন একটা দোসর নেই যার উপর চোখ বুঁজে নির্ভর করা যায়। মাঝে মাঝে ভাবি তোমাকে এই যোয়ালে যুতে দি। আবার এই অজ পাড়াগাঁয়ে তোমার মতো লোককে আটকে রাখতেও ইচ্ছা করে না। কি করি বলো তো?

মহেন্দ্র হেসে ফেললে। বললে আমি কি ক'রে বলব?

—আচ্ছা, দেখি বিবেচনা ক'রে। ততদিনে এই ব্যাঙ্কের ঝামেলাও মিটে যাবে। তুমি কিন্তু রাত জাগবে না, শরীরের উপর কোনো অনিয়ম করবে না। বুঝলে? খাবে, দাবে আর ঘুরে বেড়াবে। আমার যদি তোমার মতো একটা দাদা থাকতো!

মহেন্দ্র হেসে বললে, হিংসে করছেন?

—হিংসে একটু হচ্ছে। কিন্তু এখন আর আমার বসবার সময় নেই। খবর পেলাম, কাল রাত্রের ট্রেনে ক'লকাতা থেকে আসবাবপত্রগুলো এসেছে। তার জন্যে ষ্টেশনে কাউকে পাঠাতে হবে। বীরপুর মাহাল থেকে নায়েব এসেছেন। মাহালটা কিনে পর্যন্তই গোলমাল চলছে। তাঁর কি বলবার আছে সেও শুনতে হবে। এমনি অসংখ্য ঝামেলা। আজকে উঠলাম। তুমি কিন্তু শরীরের বিশেষ যত্ন নেবে। আর রাত্রি জাগরণটা শরীরের পক্ষে খুবই খারাপ।

নরেন যেমন ব্যস্তভাবে এসেছিল তেমনি ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেল।

আট

মহেন্দ্র খায়-দায়, ঘুমায়।

আগে সকালে বিকালে একটু বেড়াতে বার হ'ত, এখন তাও ছেড়ে দিলে। নদীতে স্নান পর্যন্ত। সকালে চা খেয়ে বাইরের দিকের বারান্দায় একখানা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে হয় বই পড়ে, নয়তো নিঃশব্দে ব'সে দূরের মাঠ, ঘাট, গাছপালার সৌন্দর্য দেখে। জলখাবার বেলায় রাখালেরা ধূলো উড়িয়ে গরু নিয়ে বার হয়। গরুগুলির শীর্ণ দেহ দেখে মহেন্দ্রের মনে পড়ে অন্য দেশের গরুর অবস্থা। সেগুলো কত হৃষ্টপুষ্ট, কত দুধ দেয় এবং তার পিছনে লোকেরা কত যত্ন নেয়।

দূরে নদীর ওপারে মেয়েরা কলসী কাঁখে ভিজে কাপড়ে জল নিয়ে যায়। ধূসর বালুর উপর চলমান তাদের ছোট্ট ছোট্ট সারি দেখা যায়। তাদের দিকে চেয়ে কত এলোমেলো কথা মহেন্দ্রের মনের মধ্যে ভিড় ক'রে আসা-যাওয়া করে।

স্কুল পালিয়ে ছোট ছোট ছেলেরা আসে বাগান-বাড়ীর বেড়ায় ফড়িং ধরতে। মহেন্দ্রের চোখে চোখ পড়তেই তারা আড়ালে আত্মগোপন করে। মহেন্দ্রের নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে সেই গোপাল পণ্ডিতের পাঠশালা, ছেঁড়া চাটাই, দীঘির ঘাটে দল বেঁধে শ্লেট মাজারধুম। কে জানে, সেদিনকার শিশুজগতের সঙ্গে আজকের শিশুজগতের সাদৃশ্য আছে কি না। কে বলবে, যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে শিশুমনেরও পরিবর্তন হয় কি না। কে জানে তাদের কালে যেমন ছিল, আজও তাই যথাযথ আছে কি না। মহেন্দ্রের জানতে খুব কৌতুহল হয়। ওদের সঙ্গে মেশবার,

ওদের কথা জানবার জন্তে মহেন্দ্রের খুব ইচ্ছা হয়। কিন্তু লজ্জায় সংকোচে পারে না।

নরেন গেছে সদরে। সেখান থেকে যাবে কলকাতায়। ফিরতে এখনও কয়েক দিনই দেরী আছে। মহেন্দ্রের এ জায়গাটা আর ভালো লাগছেনা। নরেন ফিরে এলে, তার ব্যাঙ্কের উদ্বোধন হয়ে গেলে সে পালিয়ে বাঁচবে। এখানে আর কোনো আনন্দই সে পাচ্ছে না। একঘেয়ে বই পড়ার মধ্যেও আর সে আনন্দ পাচ্ছে না।

এমনি এলোমেলো নানা কথা সে ভাবছিল। হঠাৎ এক সময় নিচে কাদের কণ্ঠস্বরে সে উচ্চকিত হ'ল।

কে যেন নিচে জিজ্ঞাসা করলে, ছোটবাবু আছেন?

ইব্রাহিমের গম্ভীর কণ্ঠ কানে গেল, সাহেব এখন বই পড়ছেন।

—আমি যাব উপরে?

—যান। ওদিকের বারান্দায় আছেন।

বিভূতির কণ্ঠস্বর বলে মনে হ'ল।

এতদিন পরে বিভূতি আসছে!

মহেন্দ্র গভীর মনোযোগের সঙ্গে খোলা বইখানার উপর ঝুঁকে পড়লো।

বিভূতি সন্তর্পণে এসে দোরগোড়ায় দাঁড়ালো। মহেন্দ্র তার আসা যেন টেরই পায়নি এমনি একমনে বইখানা প'ড়ে যেতে লাগলো।

এমন বিপদে বিভূতি জীবনে কখনও পড়েনি। সে ফিরে যাবে কি না ভাবছিলো। এমন সময় মহেন্দ্র মুখ তুলে চাইলে।

—বিভূতি বাবু যে! কি খবর? বোসো, বোসো।

বিভূতি কুণ্ঠিত ভাবে একটা চেয়ার টেনে বসলো। বললে, কাজের ভিড়ে এতদিন সময় পাইনি। নইলে রোজই মনে করি একবার আসবো।

—তা আজকে সময় পেলে কি ক'রে? দাদা নেই ব'লে?

বিভূতি হেসে ফেললে। বললে, কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। তা ছাড়া সবাই এমন ভয় লাগিয়ে দেয়।

—আমার সম্বন্ধে?

—হ্যাঁ।

—সে ভয় এখন ঘুচেছে? সিগারেট খাও।

মহেন্দ্র নিজে একটি সিগারেট ধরিয়ে টিনটা ওর দিকে এগিয়ে দিলে। বিভূতি সিগারেট ধরালে।

মহেন্দ্র বললে, কি ভয় সবাই দেখাচ্ছে? আমি সাহেব হয়ে গেছি। কেউ দেখা করতে এলে তার দিকে কুকুর লেলিয়ে দিই?

—ওই রকমই সব নানা কথা।

—নিচে কি কুকুর দেখলে?

—না তো।

মহেন্দ্র বললে, কয়েক বচ্ছর বাইরে ঘুরে এলেই বাঙালী সাহেব হয়ে যায় না। আমিও হইনি। এই যে সাহেব সেজে ব'সে আছি, এ আমার সখ নয়, দাদার সখ। তোমরা আমার বাল্যবন্ধু। একসঙ্গে কত আনন্দ করেছি। আজ তোমরাই যদি আমাকে পর ক'রে দাও, আমার খুব কষ্ট হবে।

এমন আবেগের সঙ্গে কথাগুলো বললে যে, বিভূতি বিচলিত হ'ল।

সে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে মহেন্দ্র ব'লে চললো:

আজ কত দিন হ'ল এখানে এসেছি, একটি বন্ধুও আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি একলা আমার দিন কাটে না, ভালোও লাগে না। তবু মনকে এই ভেবে সান্ত্বনা দিই যে, পরিবর্তনশীল সংসারে কিছুই থাকে না, বন্ধুত্বও না। সেজন্যে দুঃখ করা বৃথা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহেন্দ্র চুপ করলে।

বিভূতি বললে, পরিবর্তন হয়েছে বই কি মহিন। আগে সংসারে

ঝামেলা ছিল না, তালে-তালে বেড়িয়ে বেড়াতাম আর ফুর্তি করতাম। এখন তেল-নুন-লকড়ির চিন্তায় ব্যস্ত। সে সংগ্রহ করা যে কি ব্যাপার তুমি বুঝবে না।

মহেন্দ্র বললে, তুমি বুড়োও হয়ে গেছ খানিকটা। শুধু মনে নয়, বাইরেও। সে সজীবতা আর নেই।

—থাকবে কোত্থেকে বল। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত নানা ধান্দা। এই যুদ্ধ যে দুর্দিন এনেছে, তেমন দুর্দিন এদেশে কখনও আসেনি। দুর্ভিক্ষ গেছে, কিন্তু তার জের যায়নি। এদিকে কখনও ম্যালেরিয়া ছিল না, এখন গ্রাম উজাড় হবার উপক্রম। রোগ বেড়েছে, কিন্তু ওষুধ নেই। না আছে পেটে ভাত, না আছে পরণে কাপড়। মানুষের চিন্তার কি শেষ আছে?

—তা ঠিক।

দুজনেই নিঃশব্দে ব'সে রইল।

একটু পরে মহেন্দ্র বললে, তারপরে? কি খবর বলো তো? কুকুরের কামড় উপেক্ষা ক'রে যখন এসেছ, তখন একটা কিছু দরকার আছে মনে হচ্ছে।

—আছে একটু।

—কি বলো তো?

বিভূতি কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, আজ বিকেলে তোমার কি একটু সময় হবে?

—নিশ্চয় হবে। সময়ের টানাটানি আমার মোটেই নেই।

বিভূতি বললে, গায়ত্রীর আজ সপ্তাহখানেক থেকে জ্বর। সাতদিনের মধ্যে তার বিরাম হয়নি। কাকাবাবু বেশ ভয় পেয়ে গেছেন। অথচ ডাক্তার ডাকবার সামর্থ্যও তাঁর নেই। বললে, মহিন তো বড় ডাক্তার। সে কি একবার আসবে?

—নিশ্চয় যাব। চলো। এতদিন পরে তবু যাহোক একটা রোগী পাওয়া গেল, এ কি ছাড়া যায়?

—এখনই যাবে?

—না তো কি দিনক্ষণ দেখতে হবে? বেশ লোক যাহোক!

স্টেথেস্কোপটা নিয়ে তখনই মহেন্দ্র বিভূতির সঙ্গে বার হয়ে গেল।

রোগিণীর ঘরে ঢুকে মহেন্দ্র থমকে গেল।

ঘরের ভিতর থেকে একটা ভাপসা গন্ধ বার হচ্ছে। একটা ছেঁড়া কাঁথার উপর এবং আর একটি ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে গায়ত্রী শুয়ে। কাঁথা-দুখানা যেমন দুর্গন্ধযুক্ত, তেমনি মলিন। ঘর অন্ধকার।

মহেন্দ্র ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে চারিদিকে চাইতে লাগলো।

বললে, জানলা বন্ধ ক'রে রেখেছেন কেন?

বেণীমাধব বললেন, ভয়ানক হাওয়া আসে।

—আসুক। কাকাবাবু, পাঁচশো বছর ধ'রে আপনারা বাইরের হাওয়া বন্ধ ক'রে রেখেছেন। এবার একটু আসতে দিন।

গায়ত্রী দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে ছিল। জ্বরের ঘোরে তার মুখ থমথম করছে। মহেন্দ্র ওর নাড়ী দেখলে, উত্তাপ নিলে, বুক দেখলে, চোখের কোণ উলটে দেখলে।

জিজ্ঞাসা করলে, ক'দিন এই জ্বরটা হয়েছে?

—ছ'সাত দিন হবে।

—এর মধ্যে আমাকে একবার খবর দিতে পারেননি? ঘরে শিশি আছে? নেই? আচ্ছা আসুন আমার সঙ্গে কেউ আমাদের ওষুধের দোকানে। আমি ওষুধ তৈরি ক'রে দিচ্ছি।

মহেন্দ্রের সঙ্গে সদর রাস্তা পর্যন্ত এসে বেণীমাধব জিজ্ঞাসা করলে অসুখটা কি খুব বেশি মনে হচ্ছে?

চিন্তিত দৃষ্টিতে মহেন্দ্র বৃদ্ধের কাতর মুখের দিকে চাইলে।

—এদিকে কি টাইফয়েড হচ্ছে কাকাবাবু?

ভীত কণ্ঠে বেণীমাধব বলিলেন, জানিনে তো বাবা। তোমার কি সেই রকম সন্দেহ হচ্ছে?

—ঠিক বুঝতে পারছি না। গ্রামে তো হাসপাতাল নেই। রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থাও নেই। আন্দাজে চিকিৎসা। দু'চার দিন না গেলে ঠিক বুঝতে পারব না। তবে এটা ঠিক যে ভোগাবে কয়েকদিন। আমার সঙ্গে কে আসছে?

বিভূতি বললে, আমিই যাই চল।

রাস্তায় যেতে যেতে মহেন্দ্র বললে, আজ দুপুরের গাড়ীতে এখান থেকে কেউ সদরে যেতে পারে?

—কেন বলতো?

—গায়ত্রীর রক্তটা পরীক্ষা করবার জন্যে পাঠাতাম।

বিভূতি হেসে ফেললে।

বললে, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এ গাঁয়ে কারও অসুখে কখনও রক্ত পরীক্ষা করানো হয়েছে ব'লে শুনেছ? আমাদের করুণা ডাক্তার জলই দিক আর ওষুধই দিক, তাই খেয়েই যে বাঁচলো বাঁচলো, না বাঁচলে আর কি করা যায়? তার উপর হিন্দুর ঘরের বিধবা! কেই বা তার পরমায়ু চায়? বাপ-মাও চায় না, সে নিজেও চায় না।

কথাটা যে মিথ্যা নয় তা মহেন্দ্রও মনে মনে স্বীকার করলে। অথচ যে-সমাজে কাণা-খোঁড়া-কুষ্ঠরোগীরও মূল্য আছে সে-সমাজে বিধবার মূল্য কেন নেই, এর সদুত্তর সে নিজের মন থেকে কিছুতেই পেলে না।

বিকেলে সে আবার গেল গায়ত্রীকে দেখতে।

সেই বিছানাতে শুয়ে শুয়ে গায়ত্রী ছটফট করছে। মা বাড়ীতে নেই,

ঘাটে গেছেন। সংসারে নিতান্ত আবশ্যক কাজগুলো তো করতেই হবে। ছেলেমেয়েদের কতক বাইরের রাস্তায়, কতক ভিতরের উঠানে দাপাদাপি করছে। বৃদ্ধ এবং অন্ধ বেণীমাধব মেয়ের মাথার কাছে ব'সে কি যে চিন্তা করছেন তিনিই জানেন কিন্তু রোগীর শুশ্রূষার কিই বা তিনি করতে পারেন ?

মহেন্দ্রের পায়ের শব্দে তাঁর চিন্তার জাল ছিঁড়লো।

জিজ্ঞাসা করলেন, কে ?

—আমি মহিন। এখন কেমন আছে গায়ত্রী ?

—বড্ড ছটফট করছে। গাও যেন পুড়ে যাচ্ছে।

ওদের কথার শব্দে গায়ত্রী একবার চোখ মেলে চাইলে। জবাফুলের মতো লাল সে চোখ। তার সুন্দর, মসৃণ ললাটের দুটো নীল শিরা ফুলে উঠেছে।

মহেন্দ্র কাছে গিয়ে বসতেই সে খপ্ ক'রে মহেন্দ্রের একখানা হাত চেপে ধ'রে বললে, তুমি কেন এমন করে আমার পিছনে লেগেছ ? তোমাদের পায়ে আমি এমন কী অপরাধ করেছি যে, আমাকে নিশ্চিন্তে মরতেও দেবে না?

ব'লেই হাউমাউ ক'রে কাঁদতে লাগলো।

বেণীমাধব তাঁর অন্ধ চক্ষু কাপড়ের খুঁটে মুছলেন। গলাটা ঝেড়ে পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বললেন, কেঁদ না মা। ভয় কি ? মহেন্দ্র তো যে-সে ডাক্তার নয়। সে বলছে ভয়ের কিছু নেই।

মহেন্দ্র নিঃশব্দে থার্মোমিটার দিয়ে ওর শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করলে। একশো চার জ্বর। বললে, এক ফালি ন্যাকড়া আর একটা কিছুতে ক'রে একটু জল আনুন। কপালে জলপটি দিতে হবে।

অসহায়ভাবে বৃদ্ধ বললেন, আমি তো চোখে দেখি না বাবা। কী যে কোথায় আছে !

—আচ্ছা আমিই দেখছি।

খুঁজে খুঁজে ন্যাকড়া এক টুকরা পেলে। একটা গেলাসও বের করলে। তারপর নিজেই গায়ত্রীর কপালে জলপটি দিয়ে বাতাস করতে লাগলো।

নিঃশব্দে ব'সে থাকতে থাকতে বেণীমাধবের বুকের ভিতর থেকে এমন একটা ভারি নিশ্বাস বেরিয়ে এল যে, মহেন্দ্র চমকে উঠলো।

—আপনার শরীর কি ভালো নেই ?

—আমার ? না বাবা, আমার কখনও কোনো অসুখ করে না। অথচ এখন যেতে পারলেই বাঁচি।

শেষ কথাগুলো বলতে বলতে বৃদ্ধের গলা বন্ধ হয়ে এল। কাঁপতে কাঁপতে তিনি দাওয়ায় গিয়ে বসলেন।

পাড়ার কয়েকটি প্রবীণা গৃহিণী আসছিলেন বোধ হয় গায়ত্রীকে দেখতে। ঘরের ভিতর রোগিনীর মাথার শিয়রে ব'সে মহেন্দ্রকে হাওয়া করতে দেখে তাঁরা জিভ কেটে এক হাত ঘোমটা টেনে দিলেন এবং একটা অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার দেখে ফেলার লজ্জা চাপতে না পেরে একরকম দৌড়েই পালিয়ে গেলেন।

মহেন্দ্র বোধ করি তাঁদের আসা টেরই পায়নি। সে যেমন বাতাস করছিল তেমনি বাতাস ক'রেই চললো।

হঠাৎ এক সময় গায়ত্রী চোখ মেলে তার দিকে চাইলে। বললে, মহিন দা!

—কি গায়ত্রী ?

—আমার বুকে একটা ব্যথা।

—ওটা সর্দি।

—সর্দি নয়, ঠিক যেন একটা শিলের মতো চেপে ব'সে রয়েছে।

—ওইটেই সর্দি।

—না, না। ওটা অন্য জিনিস। তুমি ধরতে পারছ না।

গায়ত্রী আবার চোখ বন্ধ করলে।

চোখ বুঁজে-বুঁজেই গায়ত্রী অস্ফুটস্বরে আবার বললে, নদীর ধারের সেই করবীঝাড়টিকে মনে পড়ে?

—পড়ে বই কি।

—শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরে এসে দেখি, সেটা শুকিয়ে মরমর। আমিই তাকে জল ঢেলে ঢেলে বাঁচিয়েছি জানো?

মহেন্দ্র উত্তর দিলে না। বুঝলে এসব কথা জ্বরের ঘোরেই বলছে গায়ত্রী।

গায়ত্রী বললে, সেই পাপেই আমার এই অবস্থা হ'ল গো। মরা গাছ বাঁচাতে নেই। আমাকে একটু জল দেবে? বড় তেষ্টা পেয়েছে।

মহেন্দ্র ওর মুখে একটু জল দিতেই গায়ত্রী শান্তভাবে পাশ ফিরে শুলো এবং আর একটা কথাও বললে না। বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়লো!

নয়

সাত দিন সাত রাত্রি রোগিনীর শিয়রে ঠায় জেগে এবং একবার ডাক্তারখানা আর একবার রোগিনীর ঘর ছুটোছুটি ক'রে মহেন্দ্র শেষ পর্যন্ত গায়ত্রীকে বাঁচালে। সবাইকে বলতে হ'ল, এমন বাঁচা কেউ কখনও দেখেনি। যাকে বলে মরা বাঁচানো। সবাই বললে, হিন্দুর ঘরের বিধবার কই মাছের প্রাণ, তাই বাঁচলো। অন্য কেউ হ'লে বাঁচতো না।

জ্বর ছেড়ে যাবার পরদিন গায়ত্রী মহেন্দ্রের দিকে চেয়ে হেসেছিল। অনেকদিন পরে তার মুখে এই প্রথম হাসি।

বলেছিল, মরা গাছ বাঁচালে তো? সারা জীবন ধ'রে তার কত প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় দেখো।

মহেন্দ্র বলেছিল, দেখবো'খন। সেজন্যে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।

গায়ত্রী বলেছিল, সেজন্যে ব্যস্ত হচ্ছিও না। কিন্তু খৃষ্টানের হাতে জল খেয়েছি, ফল খেয়েছি. তার প্রায়শ্চিত্ত কি, সে তো আমাকে ভাবতেই হবে।

ব'লে হেসে পাশ ফিরে শুয়েছিল।

তার পর থেকে মহেন্দ্র আর ওবাড়ী যায়নি। যাবার প্রয়োজনও হয়নি, কেউ তাকে ডাকতেও আসেনি। কিন্তু সেই থেকে এ পর্যন্ত একটা কথাই সে দিনরাত্রি ভাবছে, গায়ত্রীকে সে বাঁচালো কেন? রোগী বাঁচানোই ডাক্তারের পেশা। সাধারণ ক্ষেত্রে ডাক্তারের মনে এ প্রশ্ন ওঠেই না। কিন্তু শুধু সেই উত্তর কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পারছে না।

কিছুদিন থেকে মহেন্দ্র বাইরে বেরুনো ছেড়েই দিয়েছে। দু'চার জন বন্ধুবান্ধব মহেন্দ্রের কাছে সবে মাত্র আসতে আরম্ভ করেছিল। মহেন্দ্রের গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে তারাও আসা বন্ধ করেছে। মহেন্দ্র একাই সারাদিন কাটায়। কখনও বারান্দায়, কখনও বাগানে একা-একা ঘুরে বেড়ায়। ভালো না লাগলে ঈজি চেয়ারে শুয়ে বই খুলে বসে। বইপড়া ভালো না লাগলে আবার বারান্দায় পায়চারি করে।

এমনি সময়ে নরেন ক'লকাতা থেকে ফিরলো এবং ফেরার এক ঘণ্টা পরেই এক গাদা কাগজ বগলে মহেন্দ্রের কাছে এসে উপস্থিত হ'ল।

এসেই বললে, সমারোহটা বোধ হয় বেশিই হয়ে গেল মহিন। ঠিক আন্দাজ করতে পারিনে। এইটে নিমন্ত্রিতের ফর্দ। এরা সবাই বড় বড় ব্যাঙ্কওয়ালা। সবাই দয়া ক'রে আসবেন। এদের জন্যে তিনখানা বগি রিজার্ভ করে এসেছি। থাকতে কেউ পারবেন না। ঘণ্টা কয়েক থেকে ফিরতি ট্রেনে চলে যাবেন। কাজের লোক, বুঝছ না? থাকবার উপায় ই[অত্যন্ত ধরা-পাড়া করাতেই আসতে রাজি হয়েছেন। এই গেল ওদিকের। এদিক থেকে আসছেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, জজ সাহেব,

পুলিশ সাহেব, এস-ডি-ও, তারপরে পাবলিক প্রসিকিউটার খান বাহাদুর সাদেক আলি আর আমাদের উকিল মনোহর বাবু। এঁরা সবাই রাত্রিটা এখানে থাকবেন। ডিনারের আয়োজনটা কি হবে সেটা বিবেচনা করতে হবে। এই সব নানা ঝঞ্চাট। তারপরে আমার অভিভাষণটাও মনোহর বাবুকে দিয়ে লিখিয়ে এনেছি। ছাপতে দিচ্ছিলাম। ভাবলাম, তোমাকে একবার দেখানো দরকার। আজকেই সেটা দেখে দিলে কাল···তোমার শরীর কি ভালো নেই মহিন? কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে?

মহিম তাড়াতাড়ি বললে, ভালোই তো আছি। আপনার সব কথাই তো শুনছিলাম। আমি বলছিলাম, আমাকে এমন চুপচাপ বসিয়ে রাখবেন না। আপনার কাজের কিছু কিছু ভাগ আমাকে দিন।

নরেন হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

বললে, সেই জন্যই তো তোমার কাছে এলাম মহিন। এই সব অতিথিদের সম্বর্ধনার সমস্ত ভারই তো তোমাকে নিতে হবে।

—তাই নোব। এরকম ক'রে ব'সে থাকতে আমার ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে।

নরেন বললে, আর একটি কাজ ক'রে এসেছি ভাই। তোমার সঙ্গে পরামর্শ করার জন্যে আর অপেক্ষা করতে পারলাম না।

—কি কাজ?

—একখানা মোটর গাড়ী কিনে ফেললাম। ওটাও দরকার, বুঝলে। এদিকে রাস্তা-ঘাট অবশ্য মোটর চলবার পক্ষে খুব ভালো নয়। তবু কয়েকটা মাস চলা যায়। সদরে যাওয়া আসা তো আমার আছেই। মোটর হলে নিজের সুবিধামত সময়ে যাওয়া-আসা করা যায়। তারপরে ষ্টেশন যাতায়াত তো দিব্যি চলে।

মহিম উৎসাহিত হয়ে উঠলো। বললে, বেশ ক'রেছেন। সদরে যাবার রাস্তা তো মিলিটারীর কল্যাণে চমৎকার হয়েছে।

নরেন খুশি হয়ে বললে, তাহলে তোমার সম্মতি আছে ?

—খুব সম্মতি আছে। আমি তো একটা ঘোড়া কেনবার কথা ভাবছিলাম। হয়তো কিনতেও হবে।

—ঘোড়া!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ক'দিন থেকে আমি ভাবছি দাদা, কলকাতায় না গিয়ে যদি এখানেই প্র্যাকটিস করতে বসি, তাহ'লে মন্দ কি হয়?

—এখানে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার তো খুব বেশি টাকার দরকার নেই। অথচ এদিকে ডাক্তারের খুব দরকার। সত্যিকার চিকিৎসা হয় না বললেই চলে।

—কিন্তু এরা তো পয়সা দেবে না মহিন।

—না দিকগে। আমার টাকার দরকারই বা কি।

নরেন এবার হাসলে। বললে, ওইটি বাজে কথা ভাই। বিনাপয়সায় কোনো কাজ হয় না। দু'দিন পরোপকারের উৎসাহে খুব হয়তো খাটলে। তারপর আর ভালো লাগবে না। তখন রোগী ডাকতে এলে শরীর খারাপ করছে ব'লে শুয়ে থাকবে। ও আমি জানি কি না।

নরেন হাসতে লাগলো।

বললে, একটা রোগী যদি বিনাপয়সায় দেখ, তার পর থেকে আর কেউ তোমাকে একটি পয়সাও ঠেকাবে না। এমনি এখানকার দস্তুর।

মহেন্দ্র হেসে বললে, ভেবে দেখি।

নরেন বললে, হ্যাঁ, ভেবে দেখ। আরও নানা কারণেই গ্রামে থাকা হয়তো তোমার সুবিধা হবে না কিন্তু সেসব ভাবনা এখন নয়। এখন আমি উঠলাম। রাত্রে তোমার খাওয়া-দাওয়ার পরে আর একবার হয়তো আসব।

ব'লে চলে গেল।

হাতে কাজ পেয়ে মহেন্দ্র নতুন উৎসাহে উদ্দীপিত হ'ল।

ব্যাঙ্কের আসবাবপত্র এসে গেছে। সেগুলো সাজানো এবং আবশ্যকীয় মিস্ত্রির কাজ চলছে। এর পরে উৎসবের জন্যে পত্রপুষ্প দিয়ে সাজানোর কাজ আছে। অভ্যাগতদের জলযোগ, রাত্রের ডিনার এবং শয়নের ব্যবস্থা করতে হবে। কি কি খাওয়ানো হবে তার ফর্দ সে রোজ করছে আর রোজ কাটছে। এর পরে সেই ফর্দ অনুযায়ী কলকাতায় লোক যাবে জিনিস আনতে।

ইতিমধ্যে মোটরগাড়ীখানা এসে গেল। ঝকঝকে নতুন মোটর গাড়ী।

মহেন্দ্র বৌদির কাছে গিয়ে ধর্ণা দিলে।

বললে, চলো বৌদি, তৈরী হয়ে নাও।

—কোথায় যাব ?

—বেড়াতে।

সুবর্ণ আকাশ থেকে পড়লো। বললে, বেড়াতে যাব কি ? এ কি কলকাতা শহর পেয়েছ ?

—আরে হেঁটে কি আর যাবে, মোটরে।

—কাদের মোটর ?

—আমাদেরই। দাদা নতুন কিনলেন। চলো তোমাকে নিয়ে খানিকটা ঘুরে আসি।

—সত্যি ?—আনন্দে সুবর্ণর চোখ চকমক ক'রে উঠলো।—তোমার দাদা কিছু বলবেন না তো ?

—কিছু বলবেন না। তুমি চলতো। ছেলেদুটোকেও সঙ্গে নাও।

—কে চালাবে ?

—আমি।

—তুমি চালাতে পারো ? যুদ্ধে গিয়ে শিখেছ বুঝি ?

—হ্যাঁ। তুমি আর দেরি কোরো না। সন্ধ্যের আগে ফিরতে হবে।

সুবর্ণর নিজেরও মোটরে চড়বার লোভে তর সইছিলো না। সে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিয়ে গাড়ীতে বসলো। মাথায় এক হাত ঘোমটা। বড় ছেলেটি সামনে কাকার পাশে গিয়ে বসলো। ছোটটি মায়ের কাছে। তাদের মুখ থেকে হাসি যেন উপচে পড়ছে।

গ্রাম পার হতেই মহেন্দ্র বললে, রাস্তায় লোক নেই, এইবার তোমার ঘোমটা খুলে ফেল। তোমার ঘোমটা দেখে আমারই গরম লাগছে।

বাদশাহী সড়কটা মিলিটারীর জন্যে সত্যই চমৎকার হয়েছে। কালো মিশমিশে পিচ-ঢালা রাস্তা। গাড়ী যেন উড়ে চলেছে দুই পাশের ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়ে।

এক জায়গায় একটা প্রকাণ্ড দীঘি। তার চারপাশে অনেকখানি মজে সমান হয়ে এসেছে। সেইখানে মোটরখানা পাশ কাটিয়ে ঘুরিয়ে রেখে মহেন্দ্র বললে, এইখানে একটু বসা যাক বৌদি। কি বল?

চারিদিকে দিগন্ত প্রসারিত মাঠ। বহু দূরে দূরে গ্রামের শ্যাম তরুরেখা দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, আকাশ লালে লাল। ছেলেরা সেই পুকুরের ধারে ছুটে ছুটে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করতে লাগলো। ওরা দুজনে ঘাসের উপর বসলো।

সুবর্ণর জীবনে এমন দিন কখনও আসেনি। এমনি উন্মুক্ত মাঠের উপর এসে বসবার কল্পনা সে জীবনে কোনো দিন করেনি। পশ্চিমের টকটকে লাল মেঘের আভা এসে পড়েছে তার মুখের উপর। চোখ যেন খুশিতে নাচছে।

দূরের একখানা গ্রাম দেখিয়ে বললে, ওইটে আমাদের শ্রীপুর। না ঠাকুর পো?

মহেন্দ্র হেসে বললে, শ্রীপুর? সে এখান থেকে পোনেরো মাইল দূরে। আমরা অনেক দূর এসে প'ড়েছি। ভয় করছে?

—না, ভয় কি? তুমি মিলিটারী বীর সঙ্গে রয়েছ।

মহেন্দ্র বললে, আমার কি ইচ্ছা করছে জানো? দাদা সঙ্গে থাকলে তোমার মুখখানা একবার দেখতেন। বাড়ীর ভিতরে তোমাকে দেখলে মনে হয় ষষ্ঠী বুড়ী। যেন কত তোমার বয়স, কত গিন্নি। এখানে দেখে মনে পড়ছে, প্রথম যেদিন আমাদের বাড়ী এলে সেইদিনের কল্যাণী মূর্তি। এ মূর্তি ভুলেই গেছলাম।

সুবর্ণ লজ্জা পেয়ে অন্য দিকে মুখ ফেরালে। বললে, তোমার দাদা এ মূর্তি দেখতে চানও না।

—এ মূর্তি ভুলে গেছেন ব'লেই চান না। এর পরে যেদিন আসব মাকেও নিয়ে আসতে হবে। আর আনব কিছু হালকা খাবার। এইখানে একটা তোয়ালে বিছিয়ে সবাই মিলে খাব। কি বল? না, আমার সঙ্গে তোমরা খাবে না?

সুবর্ণ হাসলে। শেষ কথাটার জবাব আর দিলে না। আগের বিষয়টা নিয়ে বললে, মা আসবেন, তবেই হয়েছে! আমাকে এনেছে, এতেই তোমার দাদা কি বলেন দেখ।

—বলেন, বয়ে গেল। এক কান দিয়ে ঢুকবে, আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যাবে। গায়ে তো আর ফোস্কা পড়বে না?

—তোমার হয়তো পড়বে না ঠাকুরপো। কিন্তু আমি মেয়েমানুষ, আমি তো অত শীগগির নিষ্কৃতি পাব না।

ওদের বেরুতে একটু দেরী হয়ে গেল। কারও যেন উঠতে ইচ্ছা করছিল না। যখন উঠলো, তখন সূর্য ডুবে গেছে। মাঠের উপরও ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসছে। হেড-লাইট জ্বালিয়ে মহেন্দ্র মোটরে ষ্টার্ট দিলে।

এও এক নতুন অভিজ্ঞতা। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে মোটরের এই তীব্র গতি সুবর্ণর সমস্ত দেহে এক অদ্ভুত অনুভূতি আনছিল। সেই অনুভূতি সে যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে উপভোগ করতে লাগলো।

আর একটা মাঠ পার হলেই শ্রীপুর।

হঠাৎ মহেন্দ্রের মনে হ'ল, ওদের গ্রামের কোল থেকে অনেকগুলো আলো আসছে।

বললে, সর্বনাশ বৌদি। দাদা বোধ হয় পাইক-বরকন্দাজ পাঠিয়েছেন।

চক্ষের পলকে অনুভূতির সমস্ত জাল গেল ছিঁড়ে। সুবর্ণ ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় সোজা হয়ে উঠে বসলো।

জিজ্ঞাসা করলে, কি ক'রে জানলে ?

—ওই আলোগুলো দেখছ না? মনে হয়, ফিরতে দেরি দেখে আমাদেরই খুঁজতে বেরিয়েছে।

—তুমি তাহ'লে আরও জোরে চালাও ঠাকুরপো।

ওদের লোকই বটে। অল্পক্ষণ পরে ওদের পাশ কাটিয়ে মোটরখানা বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে গেল।

বাড়ীতে ঢুকতেই সামনেই দাদা। উদ্বেগে ভদ্রলোকের মুখ শুকিয়ে গেছে।

সুবর্ণ তো একগলা ঘোমটা টেনে ছেলেদের হাত ধ'রে সুড় সুড় ক'রে ভিতরে চলে গেল। নরেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গজগজ করতে লাগলো :

—কী কাণ্ড তোমাদের! ভাবলাম, কোনো বিপদই বা হ'ল। তাও বিচিত্র নয়। বিশেষ, (নরেন গলাটা খাটো ক'রে বললে) কিছু দিন থেকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ রীতিমত দেখা দিয়েছে। এখন এরকম ক'রে বেরুনো নিরাপদ নয়। তুমি তো দেশে থাকো না, দেশের বর্তমান অবস্থাও জানো না। ছেলেমেয়ে নিয়ে এরকম বেরুনো মোটেই নিরাপদ নয়, বুঝলে ?

মহেন্দ্র তা বুঝলে কি না বোঝা গেল না। মোটরখানা গ্যারাজে রেখে নিঃশব্দে বাগানবাড়ীর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো।

পিছন থেকে নরেন চীৎকার করলে: দাঁড়াও, দাঁড়াও। অন্ধকারে বেরুনো হবে না। সাপ-খোপের ভয় বেড়েছে। ওরে রাম সিং, একটা আলো নিয়ে সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে যা।

মহেন্দ্র হাসলে। এত গোলযোগের মধ্যেও নরেনের মহেন্দ্রকে সাহেব বলতে ভুল হ'ল না!

দশ

ব্যাঙ্কের উদ্বোধন-উৎসব শেষ হয়ে গেল। এত বড় সমারোহ এদিকে কখনও হয়নি। দশখানা গ্রামের লোক উৎসব দেখতে এসেছিল। ব্যাঙ্কের বাড়ী এবং তার সামনের ময়দান এমন ক'রে সাজানো হয়েছিল যে, পাড়াগাঁয়ের লোকে হাঁ ক'রে চেয়ে দেখেছে, এবং শহরের লোকদেরও বলতে হয়েছে, চমৎকার! সভা শেষ হয়ে গেলে ময়দানে সামিয়ানা টাঙিয়ে রাত্রি দশটা পর্যন্ত গান-বাজনার আয়োজন হয়েছিল। এটা মহেন্দ্রের সখ। তাদের চারিপাশের কয়েকখানি গ্রামে অনেক ভালো ভালো গাইয়ে আছেন যাঁরা বাইরে সমাদর বড় একটা পাননি, অথচ সমাদৃত গাইয়ের চেয়ে কোন অংশে ন্যূন নন। জজ সাহেব গানের সমজদার শুনেই এই ব্যবস্থা সে করেছিল। এদের গান শুনে জজ সাহেব পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন।

সব চেয়ে খুশি হয়েছিল নরেন নিজে। এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট ছোকরা সাহেব। এর ভাই মহেন্দ্রের সহকর্মী ডাক্তার ছিল। এল-আলামিনের শিবিরের শত্রুপক্ষের গোলায় সে মারা যায়। ওঁদের দুই ভায়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। দুজনে অল্প ছোট-বড় ছিল। মহেন্দ্রকে ভায়ের সহকর্মী জেনে ম্যাজিস্ট্রেট যেন ছাড়তে চাইছিলেন না। সভার ভিতরে

এবং সভার বাইরে যতক্ষণ তিনি ছিলেন ততক্ষণ মহেন্দ্রের একখানি হাত তাঁর হাতের মধ্যে ছিল। ভায়ের সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে গিয়ে ভদ্রলোকের চোখ বারবার ছলছল ক'রে উঠছিল। অনেক কথাই তাঁর জানবার ছিল। মহেন্দ্র যথাসম্ভব সে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়।

বিদায়কালে ষ্টেশনে সকলের সঙ্গে করমর্দনের পর ম্যাজিষ্ট্রেট মহেন্দ্রকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

বলেন, মেজর মুখার্জি, তুমি আমার ভাই। মনে থাকবে সে কথা? একদিন আসবে আমার বাংলোয়? তোমার তো গাড়ী আছে। আসবে একদিন?

সন্তপ্ত ভ্রাতৃহৃদয়ের বেদনা মহেন্দ্রকে স্পর্শ করেছিল। গাঢ়কণ্ঠে সে বলেছিল, যাব, নিশ্চয় যাব।

—কথা দিচ্ছ?

—কথা দিচ্ছি।

গ্রামের লোক বুঝলে, এবং যারা না বুঝতে চাইলে তাদের নরেন ধমকে বুঝিয়ে দিলে, মহেন্দ্র লোকটা কি দরের।

রামলোচনের দিকে চেয়ে বললে, ভায়াকে নিয়ে বিপদ কম হবেনা রামলোচনদা। সাহেবের তো যেরকম গদগদভাব ও তো নিত্যি আসবে। সঙ্গে সঙ্গে মেমসাহেবও না আসতে আরম্ভ করে। তাহ'লেই হুতুর! হাঃ হাঃ হাঃ!

এ তো গেল নরেনের মুখের কথা। এর পরে আর পাঁচ জনের মুখে মুখে যখন কথাটা ছড়িয়ে পড়লো, তখন আর ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা তাঁর মেমসাহেব নন, সপরিবার স্বয়ং লাটসাহেবের অভ্যর্থনার জন্যে গ্রামবাসী প্রস্তুত হয়ে রইলো।

এর একটা ফল সদ্য সদ্য পাওয়া গেল।

পাশের গ্রামের জমিদার হরসুন্দর বাবুর সঙ্গে আর শ্রীপুরের মুখুয্যেদের

সঙ্গে চর নিয়ে একটা দাঙ্গা আসন্ন। দাঙ্গায় খুন-জখম যা হবার তা তো হবেই, অধিকন্তু একটা বড় মামলায় উভয় পক্ষকেই কম হয়রাণি ভোগ করতে হবে না।

ব্যাঙ্কের উদ্বোধন শেষ হবার সপ্তাহখানেকের মধ্যে হরসুন্দর বাবুর পক্ষ থেকে একজন বিশ্বস্ত লোক এসে জানালে, চর নিয়ে নরেনবাবুর সঙ্গে মামলা করবার ইচ্ছা হরসুন্দরবাবুর মোটেই নেই।

নরেন ভালোমানুষের মতো বললে, এ তো খুব সুখের কথা। কিন্তু সেদিনও ইচ্ছা ছিল, এখন নেই কেন?

লোকটি হেসে বললে, বুঝতেই তো পারছেন, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট থেকে লাটসাহেব পর্যন্ত সকলের সঙ্গে এখন আপনাদের যেরকম দহরম-মহরম, তাতে আপনাদের সঙ্গে ফৌজদারী করায় সুবিধা হবে না। ফৌজদারী না করলে ও মামলায় আর আছে'কি? বাবু তো সব নিজের চোখেই দেখে গেছেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সেদিন তিনি দয়া ক'রে পায়ের ধূলো দিয়েছিলেন। আদর-সম্মান কিছুই করতে পারিনি।

—বলেন কি, আপনাদের দুই ভায়ের সৌজন্যে তিনি বড় আপ্যায়িত হয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা, আগামী রাসের সময় আপনাদের দুই ভায়ের পায়ের ধূলো তাঁর গৃহে পড়ে। অবশ্য নিজেই তিনি আসবেন নিমন্ত্রন করতে।

—বিলক্ষণ! নিশ্চয়ই যাব।

লোকটি ওঠবার সময় জিজ্ঞাসা করলে, মহেন্দ্রবাবু কি আছেন? বাবু তাঁকেও নমস্কার জানিয়েছেন।

—সাহেব বোধ হয় বেরিয়েছেন।—নরেন বললে,—ওরা তো ব'সে থাকতে পারে না। তিনি ফিরলে আমি আপনার কথা জানাবো। হরসুন্দর-বাবুকেও আমাদের নমস্কার জানাবেন। একদিন দেখা হ'লে খুবই খুশি হব।

লোকটি চ'লে যাবার পর নরেন মনে মনে হিসাব ক'রে দেখলে, ব্যাঙ্কের

উদ্বোধনে যে টাকাটা তার খরচ হয়েছে, এক চর থেকেই তার দ্বিগুণ উশুল হয়ে যাবে এতে আর ভুল নেই। সে অত্যন্ত খুশি হ'ল। এবং স্থির করলে, দু'তিন দিনের মধ্যে মহেন্দ্রকে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলোয় পাঠাতেই হবে। এত বড় সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না।

এ তো গেল নরেনের কথা। আর মহেন্দ্রের ?

কাজ ফুরিয়ে যাওয়ায় সে একেবারে বেকার। আবার সেই বই পড়া আর বাগানে বেড়ানো। কিন্তু তাও ভালো লাগে না। তার কব্জাগুলোর জোড় যেন খুলে গেছে। বেশিক্ষণ ধ'রে কিছুই সে করতে পারে না। কোনো কাজেই মন বসে না।

দেশে প্র্যাকটিসে বসবার সম্ভাবনা একেবারেই বিলুপ্ত। নরেনকে সেকথা বলবারই উপায় নেই। শোনামাত্র সে উত্তেজিত হয়ে উঠছে।

—তুমি কী বলছ মহিন! ম্যাজিষ্ট্রেট যার হাত চেপে ধ'রে ছাড়ে না, সে যাবে যত ছোটলোকদের চিকিৎসা করতে? কেন? কি দুঃখে বলো। কলকাতা গিয়ে চিকিৎসা ব্যবসা করতে চাও করগে। না চাও, চুপ ক'রে ব'সে থাকো। কিছুই করতে হবে না তোমাকে। তুমি ব'সে থাকলেও আমাদের টাকা আসবে। কি ক'রে, সে আর জিজ্ঞাসা কোরো না।

মহেন্দ্র সেকথা জিজ্ঞাসাও করলে না। বুঝলে, এখানে প্র্যাকটিস করার কোনোই সম্ভাবনা নেই। নরেনের উদগ্র আভিজাত্যবোধ এবং বিষয়বুদ্ধি তাকে তা করতে দেবে না।

তাহ'লে এখন কি করবে সে? কলকাতায় ফিরে যেতে কি জানি কেন তার ইচ্ছাই করছে না।

কাল বিকেলে একবার বেরিয়েছিল নদীর ধারে। করবী গাছের ঝাড়টি দেখে এল। কত ফুল তাতে ফুটেছে। মহেন্দ্রের বুকের ভিতরটা

কেমন হু হু ক'রে উঠলো। সে আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। চলে এল।

গায়ত্রী কেমন আছে কে জানে। অনেকদিন ওদিকে যায়নি সে। যাবার কোনো উপলক্ষ্যও ঘটেনি সম্প্রতি। আশা করছে খুব সম্ভবত ভালোই আছে।

এমনি এলোমেলো হাজারও চিন্তা।

নরেন এসেছিল আজ দুপুর বেলায়। বারে বারে জেদ ক'রে গেছে দু'একদিনের মধ্যেই একবার সদরে যেতে। অত করে সাহেব ব'লে গেলেন, না যাওয়াটা ভালো দেখায় না। বিশেষ, ওঁরা জেলার কর্তা। ওঁদের সঙ্গে সৌহার্দ্য রাখার প্রয়োজনও যথেষ্ট।

সে কথাও সে ভাবছে।

নিছক অলসভাবে দিন কাটানোর চেয়ে গাড়ীখানা নিয়ে একবার ঘুরে এলে মন্দ হয় না। সকালে যাবে, বিকেলে ফিরবে। সঙ্গে যদি বৌদি যান, তা'হলে আরও আনন্দ হয়। কিন্তু বৌদি ইংরাজি জানেন না। সুতরাং ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী তাঁকে নিয়ে যাবার অসুবিধা অনেক। আর নরেন যা নিষ্ঠাবান হিন্দু, ঘরের বৌকে সেখানে যেতে দেবে, এ ভরসা নেই।

তবু মহেন্দ্র উঠলো। বৌদির সঙ্গেই দেখা করবার জন্যে। কিন্তু দোতলার বারান্দায় উঠেই সে থমকে দাঁড়ালো।

গায়ত্রী মধ্যেখানে ব'সে সুর ক'রে রামায়ণ পড়ছে। তাকে ঘিরে বসে শুনছে মা আর বৌদি। জন্মদুঃখিনী জানকীর দুঃখে দুজনেরই গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

ওর পায়ের শব্দে মুখ তুলেই গায়ত্রী পড়া বন্ধ ক'রে বইখানা এক-পাশে ঠেলে রাখলে।

মা বললেন, মহিন! কি খবর?

—খবর না থাকলে কি তোমাদের বাড়ী আসতে নেই ?

মা হেসে বললেন, তাই কি আমি বলেছি ? শোনো কথা পাগল ছেলের! এমন সময় তো বড় একটা আসিস না। তাই জিগ্যেস করলাম।

—বেশ করলে। কেঁদে তো বান এনেছ। ব্যাপারটা কি ? সীতার বনবাস ? আমি একটু শুনে কাঁদতে পাব না ?

স্বর্ণ ঝঙ্কার দিয়ে বললে, না। নাস্তিকদের আমরা রামায়ণ শোনাই না, কাঁদতেও দিই না। তার চেয়ে তুমি বরং ওই কোণে একটা মোড়া টেনে ব'সে বাইবেল পড়, আর যত খুশি হাস।

বিরাজমোহিনী বললে, আহা, তা শোনা না গায়ত্রী। বেশ পড়িস তুই। শুনতে চাচ্ছে ছেলেটা, একটু পড় না।

স্বর্ণ বললে, বুঝতে পারছেন না মা, ঠাকুরপো ঠাট্টা করছে ?

—না, না। ঠাট্টা করবে কেন ? ঠাকুর-দেবতার বই, এ কি ঠাট্টা করবার জিনিস! তুই পড়্।

গায়ত্রী সাড়া দিলে না, পড়বারও লক্ষণ দেখালে না। যেমন নিঃশব্দে ব'সে ছিল, তেমনি বসে রইলো।

মহেন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, থাকগে মা। রামায়ণ শোনবার মতো সৌভাগ্য ক'রে তো আসিনি, তুমি আর কি করবে ? তার চেয়ে বৌদি, যেজন্যে এসেছি সেইটেই বলি।

স্বর্ণ বললে হ্যাঁ, বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে সেইটে বল।

মহেন্দ্র বললে, সেটা আর কিছুই নয়, তোমার হাতের চিঁড়েভাজা খাওয়ার জন্যে বিকেলে মনটা ভয়ানক ব্যাকুল হয়ে উঠলো। ভাবলাম, তোমার কাছে গিয়ে পড়লে, এর একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হতে পারবে।

—নিশ্চয়ই পারবে! কিন্তু সাহেব মানুষের মন হঠাৎ চিঁড়ে-ভাজার জন্যে লোলুপ হয়ে উঠলো কেন ?

—সে আমিও বলতে পারব না বৌদি। ধ'রে নাও সংসারে অকারণে যেমন আরও পাঁচটা দুর্ঘটনা ঘটে, এও হয়তো তেমনি ক'রেই ঘটেছে।

স্বর্ণ হাসতে হাসতে উঠে গেল।

গায়ত্রীর দিকে চেয়ে মহেন্দ্র বললে, তুমি এখন কেমন আছ?

—ভালোই।

বিরাজমোহিনী বললে, তুই তো ওকে মরা বাঁচিয়েছিস বাবা। ওর মা সেদিন এসে তোর কী যশই গাইলে, আর কী আশীর্বাদই না করলে!

মহেন্দ্র হেসে বললে, রোগীর মায়েরা আছে ব'লেই এখনও ডাক্তারের ভাগ্যে ওইটুকু জোটে মা। নইলে তাও জুটতো কি না সন্দেহ।

গায়ত্রী ফিস ফিস ক'রে বিরাজমোহিনীকে বললে, আমি আজকে উঠি জ্যাঠাইমা। আর একদিন আসব।

ব'লে কোনো দিকে না চেয়েই গায়ত্রী নিঃশব্দে ধীরে ধীরে নেমে গেল।

এগারো

পরদিন দুপুরে মহেন্দ্র খাটে শুয়ে ছিল।

দিবানিদ্রার অভ্যাস তার নেই। তবু বাংলাদেশের তেলে-জলে এই ক'দিনেই দিনে তার একটু তন্দ্রার মতো আসছে। সামান্য একটু তন্দ্রা,—মিনিট পনেরোর জন্যে।

সেই তন্দ্রাও খুট্ শব্দে কেটে গেল।

চোখ মেলে দেখে দ্বারপ্রান্তে ছোট ভাইটির হাত ধ'রে গায়ত্রী দাঁড়িয়ে আছে। দেখে তার আর বিস্ময়ের শেষ রইল না। ব্যস্তভাবে উঠে ব'সে বললে, বোসো, বোসো। বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নেই শুনেছি। তুমি ওই কাঠের চেয়ারটা টেনে বোসো বরং!

শান্তভাবে একটু হেসে গায়ত্রী ভাইটিকে কোলে নিয়ে সেই রিক্ত মেঝের উপর ব'সে পড়লো।

বললে, তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে এলাম মহিন্ দা। অসুখ থেকে উঠে পর্যন্ত কোথাও বেরুইনি। কালই প্রথম তোমাদের বাড়ী বেরিয়েছিলাম।

ওর শীর্ণ, ক্লান্ত কণ্ঠস্বরে এবং বিশুষ্ক মুখের দিকে চেয়ে শান্তকণ্ঠে মহেন্দ্র বললে, তুমি তো এখনও সেরে উঠতে পারোনি গায়ত্রী।

—না, আমি বেশ সেরে উঠেছি। সংসারের সব কাজই এখন করতে পারি।

মহেন্দ্র বললে, সেটা ভালো নয় গায়ত্রী। আরও কয়েকদিন তোমার বিশ্রাম করা উচিত। নইলে আবার পড়বে।

গায়ত্রী ফিক ক'রে হেসে বললে, তখন তুমি আছ। দিনরাত্রি আমার শিয়রে ব'সে তুমি তখন শুশ্রূষা করবে। পাড়ার লোকেরা আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করবে। মন্দ কি?

মহেন্দ্র থমকে গেল। তার মুখ রাগে ঘৃণায় কালো হয়ে উঠলো। বললে, তাই করছে নাকি?

—করবে না? ডাক্তার আসে, রোগী দেখে, ভিজিট নেয়, চলে যায়। রোগীর শিয়রে ব'সে শুশ্রূষা কে করে? তাদের বলার তো দোষ নেই মহিনদা!

উত্তেজিতভাবে মহেন্দ্র বললে, দোষ নেই? তাদের ইঙ্গিত যেমন নোংরা, তেমনি মিথ্যে।

গায়ত্রী মুখ নামিয়ে টিপে টিপে হাসতে লাগলো। একটু কি ভাবলে। তারপর শান্তকণ্ঠে বললে, একেবারেই মিথ্যে? তোমার মনকে জিজ্ঞাসা কর তো।

মহেন্দ্র চমকে উঠলো।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, একেবারে মিথ্যে হয়তো নয় গায়ত্রী। আমার মন তোমার অগোচর নয়। কিন্তু তোমাকেও বলছি, এর মধ্যে নোংরা কোথাও নেই।

—সে আমি জানি, নইলে নির্জন দুপুরে একটা ছোট শিশুর হাত ধ'রে তোমার শোবার ঘরে আসতে পারতাম না। কিন্তু এ তুমি কী করলে মহিনদা! কেন আমাকে বাঁচালে!

অস্ফুটস্বরে মহেন্দ্র বললে, কি জানি কেন তোমায় বাঁচালাম।

দুজনে নিঃশব্দে অনেকক্ষণ ব'সে রইল।

মহেন্দ্র বললে, তোমার সেই করবীঝাড়টা সেদিন দেখে এসেছি গায়ত্রী। তাতে এখন কত ফুল!

গায়ত্রী নতমস্তকে ব'সেছিল।

তাড়াতাড়ি বললে, তুমি একটি মেমসাহেব বিয়ে করেছ ব'লে যে শোনা যায়, সেটা কি?

—সেটা মিথ্যা। আমার সম্বন্ধে যে অসংখ্য মিথ্যা গুজব রটেছে ওটাও তারই একটি।

—বিয়ের কথা কি হয়নি?

—কোনো কালে না।

—কিন্তু তুমিই তো বৌদিকে ওই রকম একটা কথা লিখেছিলে।

—না। পোর্টসৈয়দে থাকতে একটি ইংরাজ পরিবারে চমৎকার একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, সেই কথাই শুধু বৌদিকে লিখেছিলাম।

—তারপরে বিয়ে হ'ল না কেন?

—হবার নয় ব'লেই হ'ল না।

—বাধা কি? তুমি তো জাত-ধর্ম মানো না।

—না। কিন্তু হৃদয় মানি। সেই তরুণীটির সঙ্গে হৃদয়ের কোনো সম্পর্কই হয়নি।

গায়ত্রী হেসে বললে, হলেই ভালো হ'ত মহিনদা। আমাদের একটি মেমসাহেব বৌদি হ'ত।

—তোমাদের অদৃষ্ট!—কৃত্রিম সমবেদনার সঙ্গে মহেন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

ওর দীর্ঘশ্বাস ফেলবার ভঙ্গিতে গায়ত্রী হেসে ফেললে। বললে, ফুলের কথা কি বলছিলে মহিনদা? একটু তাড়াতাড়ি বল, আমি আর বেশিক্ষণ বসতে পারব না।

—ফুল? ও, সেই করবী গাছটার কথা। জ্বরের ঘোরে তুমি একদিন একটা কথা বলেছিলে গায়ত্রী: মরা গাছ বাঁচাতেই নেই, তার অভিশাপ লাগে।

—লাগেই তো।

—ফুলেভরা করবীগাছটার দিকে চেয়ে সেকথা আমার মনে লাগলো না। তবু বুকটা আমার কি রকম হু হু ক'রে উঠলো। সেখানে আর দাঁড়াতে পারলাম না। পালিয়ে এলাম।

গায়ত্রীর ছোট ভাইটা চুপি চুপি বললে, এইবার ওঠো দিদি।

—এই যে উঠি ভাই।—ব'লে তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলে, পালিয়ে এলে কেন?

—আর একটা কথা মনে পড়লো ব'লে।

মহেন্দ্র হেসে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইতেই গায়ত্রীর মুখ এক ঝলক রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো। তার বুঝতে বাকি রইল না কি কথা মহেন্দ্রের মনে পড়লো। কিশোরী মেয়ের দুঃসাহস আজও সে নিজেও ভুলতে পারেনি। আজও তার গভীর লজ্জার কারণ হয়ে রয়েছে।

তখন কতই বা তার বয়স হবে, চৌদ্দর বেশি নয়। মহেন্দ্রকে তখন তার অদেয় কিছুই ছিল না। নিজেকে নিঃশেষেই নিবেদন করেছিল। তার সবটাই ছেলেবয়সের খেয়াল কিন্তু নয়। সেই বয়সেই তার হৃদয়পদ্ম

দল মেলেছিল। সেই বয়সেই সহজাত বুদ্ধিবশে তার কি রকম মনে হয়েছিল, দরিদ্র পুরোহিত-কন্যাকে জমিদার চিন্তাহরণবাবু কিছুতেই বধূরূপে গ্রহণ করতে সম্মত হবেন না। তাই মহেন্দ্রকে হারাবার আশঙ্কা তাকে পাগল ক'রে তুলেছিল।

মহেন্দ্র সেইবার মেডিকাল কলেজের শেষ পরীক্ষা দেবে। কি একটা ছুটিতে দু'এক দিনের জন্যে সে বাড়ী এসেছিল।

সেই সময় একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে ওই করবীগাছটারই আড়ালে গায়ত্রী তাকে চুপি-চুপি ক'লকাতায় নিয়ে পালিয়ে যাবার জন্যে মহেন্দ্রকে পাগলের মতো সেধেছিল।

ওই করবীগাছটারই আড়ালে!

গায়ত্রীর লজ্জারক্ত মুখের দিকে চেয়েও মহেন্দ্র নিষ্ঠুরের মতো সেই প্রসঙ্গেরই উল্লেখ করলে।

উত্তরে স্খলিতকণ্ঠে গায়ত্রী শুধু বললে, তখন তো পারোনি।

—না, সাহস হয়নি। কিন্তু যখন শুনলাম, তোমার বিবাহ হয়ে গেল, তখন আর নিজেকে সামলাতে পারিনি। ক'দিন ধ'রে কেবলই কেঁদে-ছিলাম। সেই দুঃখেই আমি যুদ্ধে চ'লে যাই গায়ত্রী।

গায়ত্রীর চোখ হঠাৎ জ্বালা ক'রে উঠলো।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললে, ব্যস। তোমার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। কিন্তু আমার কথাটা একবার ভেবেছিলে?

তার উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে থতমত খেয়ে মহেন্দ্র বললে, তোমার কি কথাটা গায়ত্রী?

—এই বিয়ের কথাটাই। ভগবান অত শিগগির তাঁকে না নিলে আমার কি হ'ত ভেবেছিলে? তাঁকে তো আমি কিছুতেই ঠকাতে পারতাম না। মরণ ছাড়া আর কোনো পথই যে আমার জন্যে খুলে রেখে যাওনি, সে কথা ভেবেছিলে? নিষ্ঠুর! শুধু নিজে পালিয়েই বাঁচার চেষ্টা

করেছিলে! আজ মরা বাঁচিয়ে কৃতজ্ঞতা চাইছ বড় গলা ক'রে? লজ্জা করে না?

গায়ত্রী দুর্বল শরীরে হাঁপাতে লাগল।

তার উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে এবং হাঁপানোতে ছোট ছেলেটা ভয় পেয়ে একদৃষ্টে দিদির মুখের দিকে চাইতে লাগলো। এবং আর একবার তাগাদা দিয়ে চুপি চুপি বললে, চলো দিদি।

সে কথা বোধ হয় ওদের কারও কানেই গেল না।

লজ্জিত কণ্ঠে মহেন্দ্র বললে, অত কথা অমন ক'রে আমি তখন ভাবিনি গায়ত্রী। আমার অনেক অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু আজ যদি আমি তোমাকে বলি, সেই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করব, চলো আমার সঙ্গে। যাবে?

—না।

ছোট ভাইটির হাত ধরে গায়ত্রী উঠে দাঁড়ালো।

ব্যাকুল কণ্ঠে মহেন্দ্র বললে, কোনোদিন যাবে না? এ অভিমানের কোনোদিন শেষ হবে না?

শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে গায়ত্রী বললে, তুমি বুঝতে পারবে না মহিনদা। এ অভিমান নয়। তোমার কাছে আজ আমার কোনো প্রত্যাশাই নেই। চল্ খোকা!

গায়ত্রী চলে গেল।

গায়ত্রী চলে যাবার পর মহেন্দ্রের পায়ের তলার পৃথিবী দুলে উঠলো না, আকাশও পীতবর্ণ মনে হ'ল না। সে শুধু নিঃঝুম হয়ে তার বিছানায় তেমনি ক'রে বসে রইলো।

ইব্রাহিম শোবার ঘরেই ট্রেতে ক'রে চা নিয়ে এল।

চা খেয়ে অনেকদিন পরে মহেন্দ্রের কি খেয়াল হ'ল, তার সেই মেজরের পোষাকটা বের ক'রে পরলো। যখন নেমে এল তখন ইব্রাহিম আর রাম সিং দুজনেই সগর্বে সেলাম করলে। দেখা যায় প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কে অর্থনৈতিক দিকটাই সর্বত্র বড় নয় এবং বেতনটাও একমাত্র গর্বের বিষয় নয়। ইংরেজ সওদাগরী আফিসের চল্লিশ টাকা বেতনের কেরাণী দেশী মনোহারী দোকানের ওই বেতনের কেরাণীকে সমকক্ষ ভাবে না।

মহেন্দ্র গ্যারাজ থেকে মোটর গাড়ীখানা বের করলে এবং সোজা চলতে আরম্ভ করলে।

প্রচণ্ড বেগে ছোটে গাড়ী। এই তীব্রগতি আজ ওর ভালো লাগে। বন্ বন্ ক'রে সমস্ত কিছুকে পিছনে ফেলে-যাওয়া, ছাড়িয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া,—জীবনকালে হৃদয় বা সঞ্চয় করে তা পথের দু'পাশে মুঠো মুঠো ক'রে ছড়িয়ে উড়িয়ে দিয়ে যাওয়া।

এই গতি, এই যে দুর্বার গতি, এই তো জীবন।

মহাকাল।

নিশ্চল, নিস্তরঙ্গ মহাকাল।

তার বুকে ছোঁয়া লাগে গতির। জাগে মহাকাল, জাগে তরঙ্গ, জাগে সৃষ্টির আনন্দ। ঘোরে সূর্য, ঘোরে কোটি কোটি সৌরজগৎ। মহাকালের আঁচল থেকে ঝরে পড়ে পল-অনুপল-বিপলের রেনুকণা। ভোলানাথের শ্মশানে ফলে ভুলের ফসল। মানুষের চলায় আসে ছন্দ,—হারিয়ে যাওয়া ছাড়িয়ে যাওয়ার ছন্দ। আর্য ছাড়িয়ে যায় অনার্যকে, শক হুনকে। মোগল ছাড়ালো পাঠানকে, বৃটিশ মোগলকে। রক্তের সমুদ্রে বারে বারে পৃথিবী যায় ভেসে। ক্লান্ত পৃথিবী, তবু তার থামবার উপায় নাই। সমস্ত স্তব্ধতাকে স্তব্ধ ক'রে মহাকালের বিষাণ বাজে। যে থামবে, যে পিছিয়ে পড়বে, দূরের দিকে যে চাইবে না, তারই মৃত্যু হবে।

মোটর চলেছে অবারিত মাঠের বুকের উপর দিয়ে।

কালো পিচঢালা রাস্তা ভোজনশ্রান্ত অজগরের মতো নিশ্চল পড়ে ছিল। গতি সংক্রামক। মোটরের গতি তাকে ছুঁয়েচে। ছুঁয়েচে দু'পাশের গাছগুলোকে, দূরের গ্রামগুলোক, পদতলের প্রান্তরকে, মাথার উপরের মেঘলোককে।

সব ছুটছে।

ছুটছে পথ। তীব্রবেগে ছুটছে দুধারের গাছগুলো। নিঃশব্দ সঞ্চরণে ঘুরছে মাঠ-ঘাট, ঘুরছে গ্রামরেখা, ঘুরছে মেঘলোক, ঘুরছে দিগ্বিলয়।

ঘুরছে মহেন্দ্র :

শৈশব থেকে বাল্যে, বাল্য থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে। মায়ের কোল থেকে খেলার মাঠে, খেলার মাঠ থেকে করবীবনে, সেখান থেকে রণক্ষেত্রে। একটিবারের জন্যে একটুখানি সে অন্যমনস্ক হয়েছিল। অমনি বাস চলে গেল, আর ফিরে আসবে না।

গায়ত্রীর উপর তার রাগ নেই, অভিমানও নেই।

হিষ্টেরিক মেয়ে। একদিন গভীর আবেগে যে-জেদের সঙ্গে তার হাত ধরে সে নিয়ে যাবার জন্যে সেধেছিল; আর একদিন তেমনি আবেগে তেমনি জেদের সঙ্গে তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলে।

হয়ত সব মেয়েই এমনি।

হয়তো তার উপায় নেই। তার জীবনের গতি গেছে ফুরিয়ে। যাকগে—

মহেন্দ্র যখন ফিরলো তখন রাত্রি ন'টার কম নয়।

পাড়াগাঁয়ে ন'টা রাত্রি অনেক। অধিকাংশ লোকই এর মধ্যে খেয়ে শুয়ে পড়ে। আগে যখন কেরোসিন পাওয়া যেত, তখন গ্রামের কিছুটা সাড়া পাওয়া যেত। কখনও কখনও স্যাকরার দোকানে হাতুড়ি পেটার

শব্দ উঠতো। এখানে ওখানে তাস-পাশা-দাবার কোলাহল এবং রামায়ণের মধুর স্বর শোনা যেত। চাষীরা অন্ধকার দাওয়ায় ব'সে চাষ-বাস, সুখ দুঃখের গল্প করতো।

যুদ্ধ বাধার পর থেকে সে সব বন্ধ। কেরোসিন নেই, মানুষের মনে আনন্দও নিস্তেজ।

মহেন্দ্রকে অভ্যর্থনা করলে কতকগুলো ঘুমভাঙ্গা কুকুর বিরক্ত চীৎকারে। এ ছাড়া গ্রামে জাগ্রত জীবনের আর কোনো লক্ষণ পাওয়া গেল না।

গাড়ীটিকে গ্যারাজে পুরে মহেন্দ্র ফিরে এল বাগানবাড়ীতে। রামসিং এবং ইব্রাহিম পাশাপাশি ব'সে ঝিমুচ্ছিল। মহেন্দ্রের পায়ের শব্দে ধড়মড় ক'রে উঠে দাঁড়ালো।

পোষাক ছেড়ে বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে খাবার ঘরে এসে মহেন্দ্র দেখে ট্রেতে কতকগুলো চিঠি সাজানো। গ্রামে আসা পর্যন্ত চিঠি তার বড় একটা আসেনি।

খেতে খেতেই চিঠিগুলো একে একে খুলে দেখতে লাগলো। কতকগুলো বিলিতি ঔষধের পুস্তিকা। তার ক'লকাতার ঠিকানা থেকে রিডাইরেক্ট ক'রে পাঠানো। একখানি ডাক্তারী পত্রিকা। আর একখানা খামের চিঠি, লিখছে বসন্ত।

বসন্তকে সে ভুলেই গিয়েছিল।

তারই সঙ্গে বসন্তও গিয়েছিল যুদ্ধে এবং তারই মত সেও মেজর হয়ে ফিরেছে। সম্প্রতি একটি গ্রীক তরুণীর পাণিপীড়ণে উদ্যত।

অন্যগুলো একপাশে ঠেলে রেখে মহেন্দ্র এই চিঠিখানাই মনোযোগের সঙ্গে পড়তে লাগলো।

দীর্ঘ পত্র। তার অধিকাংশই গ্রীকপত্নীর কথা ও কাহিনীতে পূর্ণ। মেয়েটি নানা বাধাবিঘ্নের ফলে ওদের সঙ্গে আসতে পারেনি। এত দিনে

বহু কষ্টে এবং অনেক জায়গা ঘুরে এসে পৌঁছেচে। এবার তাদের বিয়ে হবে। দশ তারিখে দিনস্থির হয়েছে। তার পূর্বে নিশ্চয় যেন মহেন্দ্র আসে—এই অনুরোধ পুনঃপুনঃ জানিয়ে বসন্ত চিঠিখানা শেষ করেছে।

আশ্চর্য! বসন্তের এখনও মহেন্দ্রকে মনে আছে!

ওদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল বোধ হয় বেনগাজী থেকে। সেই সময় লম্বা একটা ছুটি নিয়ে মহেন্দ্র ভারতে ফিরে আসে। তার পর তাকে উত্তর আফ্রিকায় না পাঠিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায় পাঠানো হয়। সেইখানেই সে জাপানীদের হাতে ধরা পড়ে এবং শেষে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেয়।

সে কত দিনের কথা!

মহেন্দ্রের মন অকস্মাৎ সেই গ্রীক তরুণীকে দেখবার জন্যে অধীর হয়ে উঠলো। যে-মেয়ে একা কত বাধাবিপত্তি ভেদ করে, কত সমুদ্র পেরিয়ে একটা অপরিচিত দেশে, ততোধিক অপরিচিত সমাজের মধ্যে এসে তার প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হতে পারে, তাকে দেখবার প্রলোভন জয় করা মহেন্দ্রের পক্ষে কঠিন।

সে-মেয়ে গায়ত্রী নয়। গায়ত্রীর মতো তার ললাট তৃতীয়ার শশিকলার মতো ক্ষীণ নয়, চোখও কৃষ্ণতার স্নিগ্ধ এবং আয়ত নয়, চিবুকও হয়তো তেমন সুকুমার নয়। শরতের চাঁদের মত বর্ণও হয়তো নয়।

সে মেয়ের চোখ কপিশ। জ্যৈষ্ঠ মাসের রোদের মতো ঝকঝকে তার রং। প্রশস্ত ললাটের গঠন সুদৃঢ়। চোয়াল প্রশস্ত! বলিষ্ঠ তার মণিবন্ধ, এবং নাতিস্থূল দীর্ঘ দেহ লবঙ্গলতিকার মতো ললিত নয়। সে আসে সাগর পেরিয়ে প্রিয়ের সঙ্গে মিলতে।

মেয়েটিকে মহেন্দ্র এরই মধ্যে কল্পনায় দাঁড় করিয়ে ফেললো। তার পাশে গায়ত্রী মলিন হয়ে গেল, সূর্যের পাশে চাঁদ যেমন ম্লান হয়ে যায়।

খেতে খেতে মহেন্দ্র বললে, কাল আমি ক'লকাতা যাচ্ছি ইব্রাহিম।

—হ্যাঁ সাব।

—আবার কবে ফিরব তার ঠিক নেই।

—হ্যাঁ সাব।

—তোমাদের বকশিস কাল সকালেই দিয়ে দোব।

—বহুৎ আচ্ছা সাব।

ইব্রাহিম খুসি হয়ে পূর্বাহ্নেই একটা সেলাম ঠুকলে। এবং কাঁটা-চামচ প্লেট সরিয়ে নিয়ে গেল।

মহেন্দ্র বললে, কাল লাঞ্চ খেয়ে যাব, বিকেলের ট্রেণে। আমার জিনিষপত্র সব কিন্তু কাল সকালেই বেঁধেছেঁদে রাখবে। জিনিষপত্র অবশ্য বেশি নেই। তবু সকালেই ওসব সেরে রাখা ভালো। ক'দিন তোমার খুব খাটুনি গেল ইব্রাহিম। পরশু থেকে আবার কিছুদিন বিশ্রাম পাবে।

হাসতে হাসতে মহেন্দ্র শুতে চ'লে গেল। কিন্তু ঘুম আসবে কি না সন্দেহ।

বারো

বিকেলের ট্রেণে মহেন্দ্র চলে গেল।

বিরাজমোহিনী কাঁদলেন, সুবর্ণ আরও দিন কয়েক থেকে যাবার জন্তে সাধলে, নরেন কিছুই করলে না শুধু জিজ্ঞাসা করলে, তোমার সেই পুরোণো বাসাতেই উঠবে তো?

মহেন্দ্র বললে, সেই ঠিকানায় চিঠি দিলেই পাব। তাছাড়া আমি গিয়ে চিঠি দিলেই ঠিকানা জানতে পারবেন।

নরেন জিজ্ঞাসা করলে, কি করবে কিছু ঠিক করলে?

—ঠিক করিনি কিছুই। ওখানে গিয়ে ভেবে দেখব।

—ফিরছ কবে?

স্বর্ণ হেসে বললে, এখন ফিরবে না। বিয়ে-থা দাও তবে ফিরবে। নইলে ফিরতে আমি নিষেধ করে দিয়েছি।

মহেন্দ্র চলে যাবার পর স্বর্ণ জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁগা, সত্যি, ঠাকুরপোর বিয়ের কথা কিছু ভাবছ?

—কি ভাবব? ওর ওই আচার ব্যবহার, আমাদের সমাজে কে ওকে মেয়ে দেবে বলো? শহরে অবশ্য ও সব চলে।

—তা হ'লে শহরে মেয়েই নিয়ে এস।

নরেন চুপ ক'রে রইলো।

স্বর্ণ বললে আমি একটা কথা বলব?

—বলো।

—বিধবা বিবাহ আজকাল তো চলছে।

—কোথাও চলছে না। শুধু খবরের কাগজেই প্রবন্ধ বার হয়।

—না চললেও ঠাকুরপোর তাতে অসুবিধা হবে না। তুমি তো আমাদের সমাজে কিছুতেই ওকে চলতে দিলে না। ওর আর সধবাই বা কি, আর বিধবাই বা কি! শেষে একটা মেম-টেম বিয়ে করবে, সেইটেই কি ভালো হবে? এ তবু হিন্দুমতেই হোত।

নরেন হেসে বললে, কিন্তু আমাকে তুমি কী করতে বল? সধবাও আমার হাতে নেই, বিধবাও আমার হাতে নেই। থাকলেও সে বিয়ে হিন্দুমতে হ'লেও আমি দাঁড়িয়ে থেকে দিতে পারতাম না।

স্বর্ণ একটু দ্বিধা ক'রে বললে, আমি গায়ত্রীর কথা বলছিলাম। ওদের দু'জনে খুবই ভাব। দেখলে তো কি রকম ক'রে ওকে বাঁচালে। আমার মনে হয়, ওদের দু'জনের মধ্যে বিয়ে হলে···

নরেন ওকে আর কথাটা শেষ করতে দিলে না।

দুই কানে আঙুল দিয়ে বললে, ছিঃ! ছিঃ! ওকথা আর কোন

দিন আমাকে শুনিও না বড় বৌ। ও সব কানে শুনলেও পাপ হয়। তা ছাড়া তুমি কি মনে কর, ব্যাপারটা নিতান্তই সহজ? বেণীকাকাই বা রাজি হবেন কেন? অবস্থা যাই হোক, তাঁর ধর্মনিষ্ঠা এবং আত্ম-সম্মান জ্ঞান যে কত বড়, সে তো তুমি ভালো ক'রেই জান।

সুবর্ণ আর কিছু বলতে সাহস করলে না।

কেবল কুণ্ঠিত ভাবে বললে, তাহ'লে আমাদেরই বাড়ীর ছেলে কি শেষে ধর্মত্যাগ করবে?

—ধর্মতো ও অনেক দিনই ত্যাগ করেছে বড় বৌ, নামটাকে শুধু আঁকড়ে আছে।

—তাও তো আছে। এর পর যদি অন্য জাতেই বিয়ে করে? একবার তো সেই অবস্থাই হয়েছিল।

হাতের তালু উলটে নরেন বললে, করে তো আমরা কি করতে পারি বড় বৌ? সে কি ছোট ছেলে, না আমাদের হাতের মধ্যে রয়েছে? তা'ছাড়া ও ভাবনা এখনই থেকে কেন আরম্ভ করলে বড় বৌ? এই তো সবে ফিরলো। যাকনা আরও কিছুদিন।

এ প্রস্তাব মন্দ নয়।

আর গায়ত্রী?

তার বাইরেটায় পরিবর্তনের চিহ্ন মাত্র দেখা গেল না। তারই বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা দিয়ে গেছে মহেন্দ্রের মোটর, হর্ণ বাজাতে বাজাতে। কিন্তু উঠে গিয়ে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াবার কৌতূহল সে দেখালে না। ছোট ছোট ভাইবোনগুলিকে উঠানে গোল করে বসিয়ে সে তখন তাদের ভাত খাওয়াচ্ছিল, আর হুমো পাখীর গল্প করছিল। হুমোপাখীর গল্পের সঙ্গে

মোটা-মোটা গ্রাসের চেয়ে মিষ্টতর খাদ্য ছেলেদের আর জানা নেই। তার জন্যে তরকারীরও দরকার হয় না।

সেই সময় মোটরের হর্ণ তার কানে গেল।

একজন বললে, ওদের ছোটবাবু ওই যাচ্ছে দিদি।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, মহিন বুঝি ক'লকাতায় গেল?

—জানিনে তো।

—জানিসনে কি! দেখলাম যে মটোরে ক'রে গেল।

—তাহ'লে তাই গেলেন বোধ হয়।

বিকেলে গায়ত্রী গেল নরেনদের বাড়ী।

ধরা গলায় বিরাজমোহিনী বললেন, আজ মহিন এল গায়ত্রী।

এল মানে গেল। মায়ের প্রাণ, গেল বলতে বাধে।

গায়ত্রী নিস্পৃহভাবে শুধু বললে, তাই বুঝি?

তারপর স্বর্ণর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আজ রামায়ণ পড়া হবে না বৌদি?

স্বর্ণ উত্তর দেবার আগেই বিরাজমোহিনী বললেন, হবে বৈ কি? তবে কান্নার জায়গা পড়িস না বাছা, মনটা এমনিতেই ভালো নেই।

দোতলার প্রশস্ত বারান্দায় গোল হয়ে ব'সে রামায়ণ পড়া চললো। হঠাৎ একসময় পড়া বন্ধ ক'রে গায়ত্রী ব্যস্তভাবে বললে, ওই যাঃ!

সবাই চমকে উঠল:

—কি হ'ল?

—বাইরে বড়ি মেলে দিয়ে এসেছি। মা তো ঘুমুচ্ছে। গরুতে এতক্ষণ বোধহয় দিলে শেষ করে।

ঢুল একটু-একটু বিরাজমোহিনীরও আসছিল। বড়ির প্রসঙ্গে তা ছুটে গেল।

জিজ্ঞাসা করলেন, বড়ি দিলি বুঝি? কি ডালের?

—কলায়ের আছে, মুসুরেরও আছে জ্যাঠাইমা।

বিরাজমোহিনী ঘাড় বেঁকিয়ে বললেন, ছোট-ছোট মুসুরীর ডালের ফুলবড়ির টক মনে হচ্ছে কতদিন যেন খাইনি। হ্যাঁ বৌমা, তুমি না হয় জানো না, কিন্তু বাড়িতে এতগুলো ঝি-চাকরানী, তাদের বললেও তো পারো। ক্ষান্তর মা তো সজ্জাত, সেও তো একদিন স্নান করে মটকার কাপড় প'রে দিতে পারে।

গায়ত্রী হাসতে হাসতে বললে, কাউকে দিতে হবে না জ্যাঠাইমা। ডাল আনিয়ে ভিজিয়ে রাখবেন। আমিই এসে দিয়ে যাব।

ব'লে সে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

বাড়ি গিয়ে গায়ত্রী সটান ঘরের মধ্যে একটা মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লো। বড়ির ব্যাপারটা একেবারেই কল্পনা।

মা সভয়ে বললেন, অমন ক'রে এসে শুলি যে! শরীর ভালো আছে তো?

—শরীর ভালোই আছে মা, কেমন ঘুম পাচ্ছে তাই শুলাম।

—দেখিস বাছা, তুই শুলে যে ভয় করে।

শুয়ে শুয়ে গায়ত্রীর মনে হ'ল, এ ভালো হ'ল যে মহেন্দ্র চলে গেল। এই গ্রামের মধ্যে এত কাছে তার উপস্থিতি সহ্য করার দুঃখ থেকে সে বাঁচলো, সে বাঁচলো।

মহিম স্বর্ণকারের দোকানেও একটা সভা বসলো।

জনার্দন গ্রামের যাত্রার দলের পাণ্ডা। উৎসাহী ছোকরা। বললে, যাই বলো ভাই, ছোটবাবু চ'লে যাওয়ায় গ্রামটা অন্ধকার হয়ে গেছে।

কিন্তু কয়াল, সেও সামান্য ব্যক্তি নয়। যুদ্ধের বাজারে ধান-চালের কয়ালী ক'রে যা-হোক দুপয়সা করেছে।

বললে, কেন বাপু? সাহেব তো পাইপ মুখে দিয়ে ব'সে থাকতেন বাগানবাড়ীতে। মাঝে মাঝে হাওয়াগাড়ী ক'রে হাওয়া খেতে বার হতেন। তার জন্যে গ্রামটার কি এমন জৌলুস বাড়তো?

গোবর্ধন পাটের ব্যাপারী। ব্যবসাসূত্রে গঞ্জে ঘোরাঘুরি করে। গম্ভীরভাবে বললে, তাও বাড়ে হে, তাও বাড়ে। এক-একটা রাশভারী লোক থাকে যারা ঘরের ভিতর ব'সে থাকলেও গ্রাম গমগম করে। আমি পাঁচ জায়গায় ঘোরাঘুরি করি কিনা, জানি।

কিষ্টু বললে, গমগম যদি করে তো বেণী বাঁড়ুয্যের বাড়ী। আমাদের তাতে কি?

বলে একটা অভদ্র ভঙ্গিতে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো।

গোবর্ধন বললে, না হে। বলে, কানায় কি বুঝবে আলোর মর্ম? তোমার হয়েছে তাই। মর্ম বোঝে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, হাত ধ'রে যে ছাড়ে না। বোঝে দেশ-বিদেশের লোক। তুমি কয়ালী করে খাও, তুমি কি বুঝবে?

কিষ্টু পরিহাসের ভঙ্গিতে হাত জোড় ক'রে বললে, আমার বুঝেও কাজ নেই দাদা। কয়ালী আমার লক্ষ্মী, আমার শাঁখা-সিঁদুর। তোমাদের পাঁচ জনের আশীর্বাদে ওইটে বজায় থাকলেই বাঁচি। কিন্তু তোমরা তো পাঁচ গাঁয়ে ঘোর গবুদা, বলি ভেতরের খবর কিছু রাখো?

ভিতরের ব্যাপারের নামে আগ্রহে এবং কৌতূহলে সকলেরই মুখ সুচলো হয়ে উঠলো।

সবাই বললে, কি, কি, কি?

কিষ্টু বললে, আলো আলো করছিলে, এইবারে আলোয় ছয়লাপ হবে যে!

—কিসে? ছোট বাবুর বিয়ে?

—হ্যাঁ গো। আছ কোথায়?

কিনুর এক বিধবা মাসী বাবুদের বাড়ীর পরিচারিকা। সুতরাং বাবুদের বাড়ীর ভিতরের কথা জানবার তার সুযোগ আছে, তার উপর নির্ভরও করা যায়।

সবাই বললে, কবে? কবে? ঠিকঠাক হয়ে গেছে নাকি?

—বর-কনেতে হয়ে গেছে। এখন বরের দাদার অপিক্ষে।

—সেটা কি রকম হ'ল?

—এ সব সাহেব-সুবোর ব্যাপার রে দাদা! কি রকম ক'রে কি যে হয় তা, আমি কয়ালী ক'রে খাই, কি ক'রে বলব?

জনার্দন গোলমালের মধ্যে থাকে না। বললে, যা হবার তা হোক রে ভাই, আমার যাত্রাদলের একটা জমকালো রাজপোষাক পেলেই হ'ল।

গোবর্ধন বললে, হঁ্যা। আর ক'দিন পেট পুরে লুচি-মণ্ডা পোলাও-কালিয়া খাওয়া।

কিনু দুই বুড়ো আঙুল ওদের নাকের উপর নেড়ে বললে, সে গুড়ে বালি। মুর্গির ঠ্যাং দেবে মুখে ঢুকিয়ে। যাবে?

ওরা দমে গেল।

বললে, কেন? খিষ্টানী বিয়ে নাকি?

জনার্দন চীৎকার ক'রে বললে, সে কখনই হ'তে পারে না। বড় বাবু তা কখনও হতে দেবেন না। ছোট বাবুর যত দোষই থাক, দাদাকে গুরুর মতো ভক্তি করেন।

ওর অজ্ঞতায় মুখ ফিরিয়ে কিনু মুরুব্বির মতো হাসলে।

বললে, ভীমের পার্ট ক'রে ক'রে চ্যাচানি তোমার রোগে দাঁড়িয়েছে জনার্দনদা। ভেতরের ব্যাপার কিছু জানো?

ধমক খেয়ে জনার্দন দমে গেল। সবিনয়ে ঘাড় নেড়ে জানালে, কিছু জানে না।

গলা খাটো ক'রে কিনু বললে, বড়বাবুই তো এর গোড়া হে!

—কি রকম ?

—ওই যে বেঁটে-খাটো নাদুস-নুদুস মানুষটি, পেটে কি ওর কম বুদ্ধি খেলে ভেবেছ ?

সবাই নিঃশব্দে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো।

—কত্তা উইল ক'রে গেছেন, ছোট ছেলে যুদ্ধ থেকে ফিরে হিঁদুর আচার-ব্যাভার যদি না মানে, হিঁদু মতে যদি না থাকে তো সে তেজ্যপুত্তর।

তর্জনী উঁচিয়ে কিনু বলতে লাগলো :

—বিষয়-আশয়ের এক কৌড়ি সে পাবে না। ছেলে যুদ্ধ থেকে বেঁচে-বত্তে ফিরলো, বড় ভাই গাঁয়ের ষোলো-আনা লোককে দেখিয়ে দিলে, সে মোছলমানের হাতে খায়, গলার পৈতে ফেলে দিয়েছে, হিঁদুর আচার-ব্যাভার মানে না। এইবারে দেকে একটা বেধবার সঙ্গে বিয়ে। দিয়ে...

—বেধবার সঙ্গে ? বল কি হে ?

বাধা পেয়ে বিরক্ত ভাবে কিনু বললে, তক্ক কোরো না দাদা, যা বলি শুনে যাও। এ আমার ভেতরের খবর।

ব'লে চোখ পাকিয়ে বাধাদানকারীর দিকে চাইলে।

লোকটা দমে গিয়ে চুপ করলে।

সবাই কিনুকে তোয়াজ ক'রে বললে, ও চ্যাংড়ার কথা শুনো না কিনু, তুমি বলো তারপরে কি ?

গোবর্ধন ফিস ফিস ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, বেধবাটি কে হে কিনু ? আমাদের বেণী বাঁড়ুয্যের···

তার পিঠে একটা চাপড় মেরে কিনু বললে, জিতা রও দাদা, জিতা রও।' ব্যবসা কর পাটের, কিন্তু একেবারে হাঁড়ির খবর রাখ। ঠিক ধরেছ! তবে গেরস্ত ঘরের ব্যাপার, কথাটা এখন পাঁচ কান করা ঠিক হবে না।

জনার্দন অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বললে, কিন্তু বেণী বাঁড়ুয্যের···

দাঁত খিঁচিয়ে কিনু বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ বেণী বাঁড়ুয্যেরই। বিশ্বাস হচ্ছে না? বলি সমারোহের চিকিচ্ছের কথাটা জানো, না তাও জানো না? তা সে কথাও ছেড়ে দিলাম! ডাক্তার-বদ্যি রোগের চিকিচ্ছে করে। কিন্তু বেণী বাঁড়ুয্যের মেয়ে রোজ রাত্রে যে বাগানবাড়ী যেত, সেটা কোন্ চিকিচ্ছের জন্যে দাদা?

—না, না।

—না, না? ডাকো ইব্রাহিমকে, সে তো এই গাঁয়েরই লোক। ডাকো রাম সিংকে। ভজিয়ে দিচ্ছি। আরে বাবা, তাদেরই বা ডাকতে হবে কেন? আমি নিজের চোখে দেখেছি যে, ছোট ভায়ের হাত ধরে বিকেল বেলায় ছুঁড়িটা সুড় সুড় ক'রে বেরুচ্ছে।

মাসীকে যদি বা অবিশ্বাস করা যায়, ইব্রাহিম এবং রামসিংকেও, কিনুর স্বচক্ষে দেখা ঘটনা তো আর অবিশ্বাস করবার নয়।

সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। কালে-কালে হ'ল কী!

মরা করবীর অভিশাপ?

কি জানি কি। হয়তো তাই, নয়তো কলিকালেরই ক্রিয়া। সমস্ত জীবনভোর ওদের দুজনকে হয়তো এরই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

তেরো

গ্রাণ্ড হোটেলের চমৎকার একটি ঘরে মহেন্দ্র বসন্তদের খুঁজে বার করলে। একটা সোফায় পাশাপাশি ব'সে ওরা গম্ভীর ভাবে কি একটা আলোচনা করছিল।

মহেন্দ্রকে দেখে বসন্ত আনন্দে চীৎকার করে উঠলো :

—মহেন্দ্র! কী আশ্চর্য! এত শিগগির তুমি আসতে পারবে, এ আমিও ভাবিনি। অথচ তোমার জন্যে সমস্ত কাজ আমাদের আটকে। কেনা-কাটা সবই বাকি। দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই : মিঃ মহেন্দ্র মুখার্জি। 'শুধু মহেন্দ্র বললেও ইনি রাগ করবেন না। আমার ছেলেবেলার বন্ধু, সবচেয়ে বড় সত্যিকারের বন্ধু। আর ইনি···

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মহেন্দ্র বললে, মিস পেনিলোপী।

দুজনেই বিস্মিতভাবে বললে, পেনিলোপী!

মেয়েটির প্রসারিত কর মর্দন করে মহেন্দ্র বললে, হাঁ। মিস পেনিলোপী এই নাম আমি ওঁকে দিয়েছি এবং এই নামেই ডাকব ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছি, তা নাম ওঁর যাই হোক। তোমাদের পছন্দ হচ্ছে না? মিস পেনিলোপী, কিংবা তারও চেয়ে বড়। পেনিলোপী প্রিয়তমের জন্যে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করেছিলেন শুধু। ইনি তারও চেয়ে এগিয়েছেন। সাত সমুদ্র পেরিয়ে নিজেই চ'লে এসেছেন।

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝে ওরা দুজনেই খুব পরিতৃপ্তির সঙ্গে হাসতে লাগলো।

মেয়েটি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মন্থর ইংরিজিতে বললে, না, না, গোড়াতেই

আমাকে অত বড় ক'রে দেখবেন না। তাহ'লে শেষ পর্যন্ত হতাশ হ'তে হবে এবং সে দায়িত্ব আমার নয়।

মহেন্দ্র বললে, বাঃ! ইংরিজিও শিখেছেন দেখছি!

বসন্তর দিকে কৃত্রিম কোপ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করে মেয়েটি বললে, শিখতে হয়েছে। ওই ওঁরই জন্যে। আমাকে উনি কম কষ্ট দিয়েছেন ভেবেছেন। তার শাস্তি সবই তোলা আছে।

বসন্ত হেসে বললে, শাস্তির আরও একটু বাকি আছে। এবারে বাংলাটাও শিখে ফেলতে হবে। সে ভার দেবো মহিনের উপর।

মহেন্দ্রকে আর আটকে রাখা কঠিন হ'ল।

বললে, জানেন পেনিলোপী, বসন্তর চিঠি পাওয়া পর্যন্ত আপনাকে কল্পনা করতে চেষ্টা করেছি। কেমন আপনি দেখতে, কেমন আপনার কথা, এই সব। আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, আমি প্রায় যথাযথ আপনাকে এঁকেছি। কেবল গালের আপেল দুটোর কথা কল্পনা করতে ভুলে গেছলাম।

পেনিলোপী লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো।

বসন্ত হো হো করে হাসতে লাগলো। বললে, মহেন্দ্র কবি, জানো? ও সারা জীবন স্বপ্নের জাল বুনছে। অথচ ডাক্তার।

মহেন্দ্রের আবেগ তখনও মন্দীভূত হয়নি। বললে, আমার কথা থাক বসন্ত। কিন্তু তুমি ভাগ্যবান ব্যক্তি। তোমাকে আমি কনগ্রাচুলেট করি।

বসন্ত কাজের কথায় এলো। বললে, তা করো। কিন্তু দশ তারিখের তো আর দেরি নেই। কেনা-কাটা সমস্ত আজ সেরে ফেলতেই হবে।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, ফর্দ করেছ?

বসন্ত বললে, করেছি একটা। দাও তো ফর্দটা। তুমিও একবার

চোখ বুলিয়ে নাও। আমরা দুজনেই আনাড়ি। কেউ আগে বিয়ে করিনি। সেইটেই ভুল হয়েছে।

ওরা তিনজনেই হাসতে লাগলো।

বসন্ত বললে, আগে চল একটা ওয়েডিং গাউন কিনে নিয়ে আসি।

মহেন্দ্র দ্বিধাভরে বললে, ওয়েডিং গাউন!

মেয়েটির দিকে চেয়ে বললে, আপনার কি তাই ইচ্ছা?

মেয়েটি বললে, আপনি কি বলেন?

—আমি বলি কি, তার চেয়ে চমৎকার একখানা বেনারসী শাড়ী ঢের বেশি সুন্দর হবে। এদেশে বিয়ের ক'নে তাই পরে।

মেয়েটি সোৎসাহে বললে, তাহ'লে তাই হোক। বসন্ত, I must do in Rome as the Romans do. কিন্তু আর দেরি নয় মহিন, এবারে বেরিয়ে পড়া যাক।

মহেন্দ্র হেসে বললে, আর তর সইছে না?

মেয়েটিও হেসে বললে, না।

ওরা তনজনে বিজার করতে বেরুলো।

বেনারসী দেখে পেনিলোপীর ভারী আনন্দ। অনেকগুলো রকম-বে-রকমের শাড়ী কিনলে। পেনিলোপী বলেই ওকে ডাকা যাক। এখন থেকে অন্য নাম ওর গেল মুছে। এই নামই বাহাল হ'ল।

শাড়ী-ব্লাউজ-সায়া ভারতবর্ষের মেয়েরা যা পোষাক পরে সবই খুঁটিয়ে কিনলে পেনিলোপী। সে বড় কম সময়ের ব্যাপার নয়।

মহেন্দ্র বললে, দেখছি একটি বিষয়ে সব মেয়েরাই এক, পেনিলোপী। রং-বেরঙের পোষাকের মধ্যে ফেলে দিলে তাদের আহার-নিদ্রা জ্ঞান থাকে না। তা সে মেয়ে ভারতবর্ষেরই হোক, আর গ্রীসেরই হোক।

তাড়াতাড়ি হাত-ঘড়িটা দেখে পেনিলোপী লজ্জিত হ'ল।

—ওঃ! বারোটা বাজে! তুমি এক কাজ কর না বসন্ত, হোটেলে একটা ফোন ক'রে দাও, আজকের লাঞ্চে আমাদের একজন অতিথি আছেন।

মহেন্দ্র বিব্রতভাবে বললে, সে আবার কি?

পেনিলোপী ওর হাতে চাপ দিয়ে বললে, থামুন না। আজ কি নাকালটা আপনার করি দেখুন।

মহেন্দ্রকে ও ছাড়লে না। কাপড়ের দোকান থেকে নিয়ে গেল হোটেলে।

লাঞ্চে ব'সে মহেন্দ্র বললে, আমার কি মনে হচ্ছে জানো বসন্ত, মৌর্যশাসনকালের পূর্বে কিংবা পরে এমন দিন আর আসেনি। আমরা যেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের যুগে ফিরে গেছি।

—কি ক'রে?

—গ্রীস আর ভারত এই দুটো প্রাচীন দেশের মধ্যে মিলন সেই একদিন ঘটেছিল আর এই ঘটতে চলেছে।

কথাটা সবাই উপভোগ করলে। একটা রোমান্সের সৃষ্টি করার অসাধারণ ক্ষমতা মহেন্দ্রের আছে।

পেনিলোপী বললে, কিন্তু সেদিনের সঙ্গে আজকের কত তফাৎ! পৃথিবী সেদিনের চেয়ে আজ কত ছোট হয়ে গেছে। আজকে বিমানে গ্রীস ক'ঘণ্টারই বা পথ! আর ভাবুন তো আলেকজাণ্ডারের সময়ের কথা। সে-তুলনায় দূরের মানুষের কাছেও আমরা আজ কত বেশি পরিচিত।

সেই গতি, Speed এর কথা!

পেনিলোপী বললে, আজ আমাকে আসতে দেখে অবাক হচ্ছেন,

শিগগিরই হয়তো দেখবেন মঙ্গল গ্রহের মেয়ে নেমে আসছে পৃথিবীর ছেলেকে বিয়ে করবার জন্যে।

বসন্ত বললে, আগে পৃথিবী যখন বড় ছিল, দূর যখন এত কাছে আসেনি তখন একটা সমাজব্যবস্থা চলেছে। তুমি রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, আমি বারেন্দ্র, আমাদের মধ্যেও বিবাহের চলন নেই। তখনকার দিনে মেদিনীপুর থেকে রাজসাহীতে বিয়ে করতে যাওয়া সহজও ছিল না। মানুষ তখন ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে বাস করত। আজ সে-অসুবিধা কেটে গেছে। আমাদের সমাজকেও আজ এই যুগের উপযোগী ক'রে গড়ে তুলতে হবে। তা যদি না পারি, তা'হলে আমরা ঠকব।

মহেন্দ্র এই তো তাদের গ্রাম থেকে ফিরে আসছে।

বললে, জাত যাবে যে হে!

বসন্ত হাতের মুঠো শক্ত ক'রে বললে, জাত যে যায় না, যাবার নয়, সেই কথাটাই প্রমাণ করতে হবে।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, কি ক'রে?

—জাত যে গেল না সেইটে দেখিয়ে দিয়ে।

—কিন্তু দেখাব কাদের? তারা যে চোখ বন্ধ ক'রে রয়েছে!

—চোখ বন্ধ করে কতদিন থাকবে মহেন্দ্র? চোখ একদিন তাদের মেলতেই হবে। শুধু একটা প্রচণ্ড ধাক্কার অপেক্ষা।

পেনিলোপী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, আপনি বিবাহ করেছেন?

—না।

—করবেন না?

—না। আমি স্থির করেছি, মঙ্গল গ্রহ থেকে মেয়ে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব।

সবাই হাসতে লাগলো।

ওদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল।

পেনিলোপী মহেন্দ্রের হাত ধ'রে হাসতে হাসতে বললে, আপনার পালানো চলবে না মহিন। আবার আমরা এখনই বাজার করতে বেরুবো। আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

মধ্যেকার চারটে দিন মহেন্দ্র ওদের সঙ্গে খুব ঘুরলো। কেনা-কাটি খুব বেশি ছিল না। অত্যন্ত সংক্ষেপে এবং অত্যন্ত সংযতভাবেই বিবাহ সম্পন্ন হলো। তিন আইনের বিবাহ। ঝামেলা বিশেষ নেই। বসন্ত নিমন্ত্রণও বিশেষ করেনি। শুধু তার হু'তিনজন বন্ধুকে হোটেলে নিমন্ত্রণ করেছিল।

সংযত আমোদ-প্রমোদের মধ্যে যখন উৎসব শেষ হ'ল, তখন রইল বসন্ত, পেনিলোপী আর মহেন্দ্র।

বসন্ত বললে, এইবার আমাদের একটা বাড়ী দেখে দাও মহেন্দ্র। আমরা গৃহী হয়ে বসি।

মহেন্দ্র বললে, সেইটেই মুস্কিল। বাড়ী পাওয়াই কঠিন। ক'লকাতায় বাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না।

—কেন?

—সে অনেক ব্যাপার। মোট কথা বাড়ী সহজে পাবে না। তবে আমি অকারণেই একটা বাড়ী নিয়ে আছি। কিন্তু পাড়াটা একেবারেই দিশী। যদি মেমসাহেব নিয়ে থাকতে আপত্তি না থাকে, আমি উপরের তলাটা তোমাদের ছেড়ে দিতে পারি।

বসন্ত উৎসাহের সঙ্গে বললে, কি আশ্চর্য! থাকতে পারব না কেন? পেনিলোপী, আমরা কি দিশী পাড়ায় থাকতে পারি না?

পেনিলোপী সানন্দে বললে, নিশ্চয় থাকতে পারি। বিশেষ মহিনের দর্পক্ষণের সাহচর্যই তো একটা মস্ত বড় প্রলোভন। বাড়ীটা কি রকম?

মহেন্দ্র বললে, সব কথাই বলি। বাড়ীটা আমি কেনার চেষ্টায় আছি। হয়তো হয়ে যাবে। তেতলা বাড়ী, কিন্তু বড় নয়, ছোট। প্রত্যেক তলায় বড় বড় দুটো ক'রে ঘর আছে। তাতে তোমাদের চলবে?

একটু চিন্তা করে পেনিলোপী বললে, তা চলে যাবে। কি বল?

ব'লে বসন্তর মুখের দিকে চাইলে।

বসন্ত চোখ বন্ধ করে এক মুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে, সে আমি কি জানি? এরপর কি হবে, কি হবে না, সে ঠিক করবার ভার তোমার না?

পেনিলোপী হেসে বললে, এখন থেকেই?

—এখন থেকেই।

মহেন্দ্রের দিকে চেয়ে পেনিলোপী বললে, বেশ, তা'হলে কবে তোমার বাড়ীটা দেখতে যাচ্ছি বল?

—যে কোন মুহূর্তে। আমার গরীবখানার দ্বার তোমাদের জন্যে সমস্ত সময়ই উন্মুক্ত।

—তা'হলে আজ বিকেলে যাব। বাড়ী থেকো যেন।—পেনিলোপী বসন্তের দিকে চেয়ে বললে,—দুখানা ঘরে একটু অসুবিধা হবেই। কিন্তু আমি ভাবছি যতদিন তোমার রোজগার না হচ্ছে, ততদিন একটু কষ্ট করেই চলব আমরা। দুটি তো প্রাণী, একটি চাকর হ'লেই আমাদের চলে যাবে।

মহেন্দ্র বললে, এইবার কাজের কথায় আসা যাক! তুমি তো আর এখন বাউণ্ডুলে নও বসন্ত, দস্তরমতো গৃহী। রোজকারের কি ব্যবস্থা করছ?

বসন্ত বললে, কি করি বলো তো? চাকরী-বাকরী একটা হ'লেই বোধ হয় ভালো হয়। কিন্তু তার তো খুব বেশি সম্ভাবনা দেখছি না। তুমি কি ঠিক করছ?

মহেন্দ্র হেসে বললে, আমার তো চাকরীর আশা নেই। হয় প্র্যাকটিসে বসতে হবে, নয়, এবং এইটেই আমার ইচ্ছা, একটা ক্লিনিক খুলতে হবে।

—আমাকে সঙ্গে নেবে ?

—সে তো ভালোই হবে। একটা ঘর ভালোমত দেখতে হয়।—মহেন্দ্র আগ্রহভরে বল্লে,—তুমি এস বসন্ত। আমার মুস্কিল কি জানো, আমার নৌকো নোঙর-করা নেই। ভেসে যাওয়ার আশঙ্কাই ষোলো আনা। তুমি থাকলে হয়তো বা মন লাগিয়ে স্থায়ী ভাবে কিছু করতে পারি।

এ বিষয়ে বসন্তর উৎসাহের কোনো অভাব দেখা গেল না।

চৌদ্দ

মহেন্দ্রের বাড়ীটা ওদের মোটামুটি পছন্দ হয়েছে। পরের দিনই ওরা জিনিষপত্র নিয়ে এসে উপস্থিত হ'ল।

আসা পর্যন্ত মহেন্দ্র পেনিলোপীর কাজ করবার শক্তি এবং নিপুণতা দেখতো লাগলো।

বসন্ত ব'সে ব'সে সিগার খায়। ঘরের কাজ তার এলাকায় পড়ে না। ঘোরে পেনিলোপী। এই ক'দিনেই ও মোটা-মুটি ক'লকাতার রাস্তা চিনে ফেলেছে। দেখতে দেখতে নিয়ে এল কতকগুলো আসবাবপত্র। এলো গ্যাস-ষ্টোভ, কার্পেট, রান্নার এবং খাবার বাসনপত্র, কতকগুলো ফুলগাছ সমেত টব, টুকিটাকি আরও অনেক কিছু। মহেন্দ্রের ভূতুড়ে বাড়ী দেখতে দেখতে নন্দন-কাননে পরিণত হ'ল।

মহেন্দ্র বুঝলে এরা মানুষের মতো বাস করতে জানে।

দুখানি তো ঘর। তার একখানি হ'ল শোবার। আর একখানি পর্দা দিয়ে দু'ভাগ করে একটি বসবার এবং একটি লেখবার ঘর হ'ল। সামান্য কয়েকটি আসবাবপত্র, ক'খানি মাত্র ছবি, তাই দিয়েই ঘর সাজালে এমন চমৎকার ক'রে যে, তার রুচির পরিচয় পেয়ে মহেন্দ্র মুগ্ধ হ'ল।

মহেন্দ্র ধ'রে বসলো, তার দোতলাটিকেও অমনি চমৎকার ক'রে সাজিয়ে দিতে হবে।

তাতে পেনিলোপীর বিরক্তি নেই।

মহেন্দ্র বললে, বাড়ীটা কেনা হ'য়ে যাক। তারপর সমস্ত বাড়ীটার মনের মত ক'রে সংস্কার করতে হবে। সে কাজের ভারও পেনিলোপীকেই নিতে হবে।

বললে, জানো পেনিলোপী, আমাদের বাস করার পদ্ধতি আর তোমাদের বাস করার পদ্ধতি এক নয়।

—না হওয়াই স্বাভাবিক।

—সাদাসিধে জীবনযাত্রা এবং উঁচু চিন্তাধারা, এইটেই আমাদের আদর্শ।

—সে তোমাদের দেখলেই বোঝা যায়।

—কিন্তু যুগ বদলে গেছে। আজ তার কিছু পরিবর্তন করা দরকার।

—কর। কে বাধা দিচ্ছে?

—আমাদের আলস্য এবং স্বভাবসিদ্ধ ঔদাসিন্য। উঁচু চিন্তাধারা আমরা ছেড়ে দেবার চেষ্টায় আছি। কিন্তু সাদাসিধে জীবনযাত্রার আকর্ষণ কিছুতেই ছাড়তে পারছি না। এঁদো স্যাঁৎসেতে ঘর, ছেঁড়া মাদুর আর মলিন বালিশ,—সাধারণ ভারতবাসীর বাস করার আদর্শ এর উপরে উঠলো না।

—এর সবটাই আলস্য এবং ঔদাসিন্যের জন্যে নয় নিশ্চয়ই। দারিদ্র্যের কথাটাও বলো।

—তাও বাদ দোব না। কিন্তু মানুষ যদি পণ করে, এমন একটি ঘর তার চাই, সমস্ত দিনের কাজকর্মের পরে যেখানে এসে বসলেই দিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে, তাহ'লে সে তা পেতে পারে না এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না। আমার কথাই ধর। ভগবানের ইচ্ছায় অর্থের আমার বিশেষ অভাব নেই, তবু কি অবস্থায় ছিলাম, সে তো নিজের চোখেই দেখেছ।

পেনিলোপী সে কথার উত্তর দিলে না।

পালটা প্রশ্ন করলে, এ তো ভারতবর্ষের অন্ধকার দিকটার ছবি মহিন্‌, আলোর দিকের কথাও কিছু বলো।

—আলোর দিক ? সেও এক হৈ হৈ ব্যাপার। অনাবশ্যক প্রাচুর্যের আর এক অস্বস্তিকর অধ্যায়। যত নেবে তার দ্বিগুণ ছড়াবে, যত ছড়াবে তার দ্বিগুণ হাঁকডাক ছাড়বে। ঐশ্বর্যের সে এক কুরুচিকর সমারোহ ! আশা-সোটা, কাড়াকাড়া, কত কি !

—এই কি ভারতবর্ষের সবটা ছবি ?

—না। ভালো দিকও যথেষ্ট আছে, নইলে এ জাতটা কবে ম'রে যেত, এতদিন বাঁচতো না।

—সেটা তো বললে না।

—না। এই দেশের বধূ হয়ে তুমি এসেছ। সেটা তোমাকে নিজেই খুঁজে নিতে হবে।

দুই হাতের মুঠো শক্ত করে পেনিলোপী বললে, তুমি দেখে নিও, সে আমি খুঁজে নোবই।

—তাই নিও। কিন্তু তোমার বাংলা শেখার কাজ আরম্ভ করবে কবে থেকে ?

—আমি তো বলি আজ সন্ধ্যা থেকেই আরম্ভ হোক।

মহেন্দ্র খুসি হয়ে বললে, বেশ। আরম্ভ যা করতে হবে, তা আজ থেকে আরম্ভ করাই ভালো। আমি বিকেলে তোমার বই কিনে নিয়ে আসব। এখন উঠি।

একটা ভাষা যার জানা আছে, আর একটা ভাষা কাজচলাগোছের শিখতে যে তার বিলম্ব হয় না, পেনিলোপী তা প্রমাণ ক'রে দিলে। যে যে-দেশেই থাক না কেন, এই সুবৃহৎ মানবসমাজের চিন্তাধারা ও প্রকাশ-

ভঙ্গির মধ্যে একটা মূলগত গভীর ঐক্য আছে। পেনিলোপী অনায়াসই প্রয়োজনীয় বাংলা শব্দ এবং ক্রিয়াগুলি দ্রুত শিখে ফেলতে লাগলো।

বাংলা ভাবা বোঝবার কিছু শক্তি যখন ওর হয়েছে তখন ওরা তিনজনে একদিন বাংলা সিনেমা দেখতে গেল।

ছবিটা বিলিতি ছবির তুলনায় একেবারেই খেলো এবং চতুর্থ শ্রেণীর। পেনিলোপীর ভালো লাগবার কথা নয়, এবং লাগেওনি। কিন্তু একটা জিনিস ও অন্তর ভ'রে নিয়ে এল। সে হচ্ছে এদেশের মেয়ের কোমলতা এবং সলজ্জ প্রেমনিবেদন। ওর বিদেশী চোখে এ জিনিসটা এত মিষ্টি লাগলো যে, বাড়ী পৌছুবার পর পর্যন্তও ভুলে-যাওয়া গানের রেশের মতো ওর সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে বাজতে লাগলো।

রাত্রে নানা অবান্তর গল্পের মধ্যেও মহেন্দ্রকে হঠাৎ এক সময় জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কখনও প্রেমে পড়েছ মহিন?

মহেন্দ্র নিরীহভাবে উত্তর দিলে, কখনও কখনও পড়েছি বইকি।

পেনিলোপী এতই অন্যমনস্ক ছিল যে, ব্যঙ্গের সুরটা ঠিক ধরতে পারলে না। সরলভাবে জিজ্ঞাসা করলে, সে তোমাকে ভালবাসতো?

—কখনও কখনও বাসতো বইকি।

বসন্ত একটু সোডা আর হুইস্কি নিয়ে এল। বললে, কি? প্রেমের গল্প? চমৎকার! হুইস্কি আর সোডার সঙ্গে এই শীতের সন্ধ্যায় চমৎকার জমবে!

সবাইকে সে গ্লাসে-গ্লাসে ঢেলে দিলে।

পেনিলোপী বললে, এখন তার সঙ্গে দেখা হয়?

তেমনি নিরীহভাবে মহেন্দ্র উত্তর দিয়ে বললে, হয়। স্বপ্নে।

গ্লাসে একটু চুমুক দিয়ে পেনিলোপী বললে, স্বপ্নে? জাগরণে না?

নিজের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে মহেন্দ্র বললে, না। সে অবস্থা এখনও আসেনি।

—তার মানে?

—শুনেছি, উন্মাদ না হ'লে সে অবস্থা আসে না।

এতক্ষণে পেনিলোপী বুঝতে পারলে। বললে, ঠাট্টা করছ?

বসন্ত ওকে বুঝিয়ে দিলে, আমাদের সমাজে প্রেমে পড়ার সুযোগ কদাচিৎ ঘটে। আগে তো ছেলেমেয়ের খুব অল্প বয়সেই বিয়ে হ'ত। এখন বড় বয়সে বিয়ে হচ্ছে বটে, কিন্তু তাতেও প্রেমে পড়ার অনেক বাধা।

পেনিলোপী জানতে চাইলে, কি রকম?

বসন্ত বললে, প্রেমের চরম উদ্দেশ্য যদি বিয়ে করা হয়, তাহলে ঝঞ্ঝাট অনেক। আমাদের বিবাহ হয়, গাঁই-গোত্র, ঠিকুজি-কোষ্ঠি মিলিয়ে। কিন্তু ঠিকুজি মিলিয়ে তো আর সত্যি সত্যি প্রেম করা যায় না।

হতাশভাবে পেনিলোপী বললে, তাহ'লে?

মহেন্দ্র বললে, তাহ'লেও আমাদের বিয়ে হয়। ঠিকুজি-কোষ্ঠি মিলিয়ে অভিভাবকেরা একটি সুলক্ষণা কন্যা দেখে আসেন। নির্দিষ্ট দিনে ছেলে অভিভাবক এবং বন্ধুবান্ধব পরিবৃত হয়ে সেই কন্যাকে বিবাহ ক'রে আনে।

শুনতে শুনতে পেনিলোপী খুব কৌতুক বোধ করছিল। জিজ্ঞাসা করলে, অথচ সেই মেয়েটিকে ছেলেটি চিনতোও না?

মহেন্দ্র উত্তর দিলে, হয়তো কখনও দেখেওনি, তার গ্রামের নাম পর্যন্ত শোনেনি।

—তাতে কোনো পক্ষেরই কোনো অসুবিধা হয় না?

মহেন্দ্র বললে, সে-সম্বন্ধে আমাদের কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই। তবে যতদূর দেখিছি, অসুবিধা হয় ব'লে বোধ হয় না। বরং অপরিচয়ের অস্পষ্টতার জন্যে রোমান্সের রহস্য ঘনিয়ে আসে।

স্তম্ভিতভাবে পেনিলোপী বললে, আশ্চর্য! জীবন কাটে কি রকম ক'রে?

—সব দেশেরই আর পাঁচজনের মতো ক'রে, অর্থাৎ ভাব ক'রে, ঝগড়া ক'রে এবং আবার ভাব ক'রে। জানো পেনিলোপী, আমাদের সমাজে ডাইভোর্স নেই, বিধবার দ্বিতীয়বার বিবাহও হয় না।

শুনে পেনিলোপীর চোখ কপালে উঠলো।

গলাটা একটু ভিজিয়ে নিয়ে ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, কিন্তু এ কি ভালো? তুমিই বলো বসন্ত।

—জানি না।—বসন্ত বললে,—তবে আমার মনে হয়, আমাদের এই সুপ্রাচীন দেশে এ বিষয়ে নানা রকম পরীক্ষাই হয়েছে নিশ্চয়, এবং অনেক দেখে শেষে এই ব্যবস্থাই পাকা হয়েছে। কিন্তু এও নিশ্চয় যে, যুগের প্রয়োজনে যদি কোনোদিন দেখা যায়, এ ব্যবস্থা উপযোগী নয়, তাহ'লে এ ব্যবস্থা ভেঙ্গে যেতেও বিলম্ব হবে না।

পেনিলোপী খুশি হ'ল না। মহেন্দ্রের দিকে চেয়ে বললে, তোমারও কি এই মত?

—না।

—কেন নয়? এর বিরুদ্ধে কি তোমার যুক্তি?—বসন্ত প্রশ্ন করলে।

মহেন্দ্রের মস্তিষ্কে হুইস্কির ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে।

বললে, কোনো ধর্মশাস্ত্রের অথবা ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তি নয়, এ আমার হৃদয়ের যুক্তি। আমার স্বভাব পরিহাস-প্রবণ। হাসি দিয়ে আমি হৃদয়ের ক্ষত ঢেকে থাকি। তোমরা শোনো আমার কথা।

শীতের রাত্রি। নিস্তব্ধ নিঃঝুম।

ঘরের আলোয় বাইরে চাঁদ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। পিছনের কি একটা বড় গাছের ডাল নেমে এসেছে এদের জানালার কাছ বরাবর। হাওয়ায় দুলছে সেই ডালের পাতাগুলি, ছায়ামূর্তির ইসারার মতো। বস্তির ওপাশের বাড়ীটার জরাজীর্ণ দেওয়ালে কোন্ একটা বাড়ীর তীব্র আলো এসে পড়েছে। মনে হচ্ছে কত যেন রাত।

গায়ত্রীর গল্প বড় নয়, নিতান্তই ছোট। অবরুদ্ধ কণ্ঠে সেটুকু শেষ করতে মহেন্দ্রের দশ মিনিটের বেশি লাগলো না।

গল্প যখন শেষ হ'ল, কারও মুখ থেকে একটি কথাও বেরুল না। সবাই স্তব্ধভাবে ব'সে রইল।

অনেকক্ষণ।

জানালার বাইরে শুকনো গাছের পাতা মুড়মুড় ক'রে মাঝে মাঝে ঝ'রে পড়ছিল।

অনেকক্ষণ পরে পেনিলোপী মৃদুকণ্ঠে বললে, গায়ত্রীকে দেখতে বড় ইচ্ছা করছে।

কেউ তার কোনো উত্তর দিলে না।

পনেরো

আমন ধান কাটা আরম্ভ হয়ে গেছে।

নিহত সৈন্যের মতো কাটা ধান মাঠময় শুয়ে আছে। সোনায় ডুবে গেছে সমস্ত মাঠ। ধান বেশ ভালোই হয়েছে। তবু গৃহস্থ গালে হাত দিয়ে ব'সে আছে। ধান কাটবার লোক নেই। যারা রয়েছে তারা ম্যালেরিয়ায় ধুঁকছে। একদিন পেটের জ্বালায় কোনোমতে মাঠে যাচ্ছে তো তিন দিন আর উঠতে পারছে না।

নবান্নর পরেই গ্রামের কোলের জমিগুলির ধারে ধারে ধান কাটা হয়ে গেছে। তারই উপর দিয়ে গরুর গাড়ীর রাস্তা পড়েছে। কিন্তু ধান আনার অভাবে এখনও তাতে প্রচুর ধুলো জমতে পারে নি।

কি করে যে মাঠের লক্ষ্মী ঘরে আনা হবে সেই চিন্তায় সবাই পীড়িত। কেবল সান্ত্বনা এই যে, ধান চুরি যাবার ভয়ও নেই। যারা চুরি করতে পারে তারা সবাই শয্যাগত। কেউ কেউ ভালো থাকলেও শীতের শিশির ভোগ ক'রে ধান আনতে গিয়ে প্রাণ খোয়াবার আগ্রহ তাদের নেই।

চিন্তা বেশী নরেনের।

অল্প লোকের কম জমি। কোনোরকমে টেনেটুনেও ধান হয়তো ঘরে তুলবে। কিন্তু নরেনের তো তা নয়। তার প্রচুর জমি। সে জমির ধান এই সব রোগী মজুরদের দিয়ে রয়ে-বসে ঘরে আনতে হ'লে বাংলা বৎসর শেষ হয়ে যাবে।

রামলোচন তাকে পরামর্শ দিলে বাইরে থেকে কিছু সাঁওতাল নিয়ে আসতে। তাতে মজুর সমস্যাও মিটবে।

সেই পরামর্শই হচ্ছিল।

এমন সময় ছোট একটি ছেলের কাঁধে হাত দিয়ে অন্ধ বেণীমাধব এসে সদরের প্রকাণ্ড বড় উঠানে দাঁড়ালেন। অন্ধ-চক্ষু চারিদিকে ঘুরিয়ে ডাকলেন, নরেন বাবাজি আছ নাকি?

—আসুন, আসুন। ওরে কাকাবাবুকে একটা জলচৌকি দে।

উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বেণীমাধব বললেন, এইখানেই দাও বাবা। খাসা রোদ আছে এখানে। বুড়ো মানুষ ছায়ায় বসলে শীতে যেন জ'মে যাই।

নরেন কাছে এসে দাঁড়ালো।

তার পায়ের শব্দে আন্দাজে তার মুখের দিকে চেয়ে বেণীমাধব বললেন, তোমার কাছে একটা পরামর্শ নিতে এলাম বাবাজি।

প্রতি বৎসর এই সময়ে বেণীমাধব একবার ক'রে নরেনের কাছে পরামর্শ নিতে আসেন।

নরেন হেসে বললে, গায়ত্রীর শ্বশুরবাড়ীর জমির সেই ধান তো? ও সমস্যা তো প্রতি বৎসরই একবার ক'রে ওঠে। বলি চুকিয়ে ফেলুন, তাও ফেলবেন না।

—কি ক'রে ফেলি বল? নিঃসন্তান বিধবা, ওর তো দান বিক্রির অধিকার নেই।

নরেন ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, অধিকার তো জোরের। জোর থাকলেই অধিকার থাকে।

—ওর জোরই বা কোথায় বাবা ?

—ওর নিজের না থাকে, যার জোর আছে তাকে বেচে দিক। দু'টাকা দাম হয়তো কম পাবে, কিন্তু বছর বছর এই ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে তো বাঁচবে।

—মেয়েটা বড় ভালো, বুঝলে না বাবা। দেওর-ভাসুরে জমির ধান যে বছর বছর লুটে নিচ্ছে কখনও তা নিয়ে একটা অভিযোগও করে না। আমি বললে হেসে বলে, নিক গে বাবা, ওঁদেরই তো জমি। শুনলে কথা!

নরেন চুপ করে রইলো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেণীমাধব বললেন, ওই যে বললাম বাবা, লক্ষ্মীর প্রতিমা। এ জন্মে কোনো পাপ তো করে নি। হয়তো আর জন্মে ক'রে থাকবে, সেই পাপে এত কষ্ট পাচ্ছে।

বেণীমাধব আর একবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বললেন, চোখে যে দেখি না, সে বোধ করি ভালো হয়েছে বাবাজি। ওর মুখ দেখলে আমি তো একটা দিনও এ সংসারে থাকতে পারতাম না। এখনো থাকতে ইচ্ছা করে না বাবা। বড় দুটো খুঁটে খেতে শিখেছে, তাদের জন্যে চিন্তা নেই। কিন্তু এই দুটো যে নিতান্তই শিশু, এদের কার কাছে রেখে দিয়ে যাই? নইলে তোমার কাকীমা আর গায়ত্রীকে নিয়ে কবে চলে যেতাম কাশী। সংসারে আর থাকতাম না। কিন্তু বিশ্বনাথ সে পথও যে বন্ধ করে রেখেছেন।

কাপড়ের খুঁটে চক্ষু মার্জনা করে বেণীমাধব বলতে লাগলেন, এই তো গেল একদিক। আবার দেখ, বয়স হয়েছে চোখে দেখি না, দেহ জীর্ণ। ভগবানের নাম করে এখন শান্তিতে দু'চোখ বন্ধ করতে পারলেই নিশ্চিন্ত হবার কথা। কিন্তু তারও তো যো নেই। হতভাগীর কথা ভাবলে মরার চিন্তাও তো করা যায় না।

বৃদ্ধ চুপ করলেন।

মামলার গন্ধে রামলোচন অনেকক্ষণ থেকেই উসখুস করছি হয়তো সুযোগ পেয়ে বললে, গায়ত্রীর শ্বশুর বাড়ীর জমি আপনি। সে বাঁড়ুয্যে মশাই। বলেন তো আমি ভালো দামেই বিক্রির শু হ'লে দিতে পারি।

—পারো?—বেণীমাধব নরেনকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন—তু। কি বল বাবাজি?

নরেন বললে, আমিও তাই বলি। কিন্তু একটা কথা ভাববার আছে।

—কি বল?

নরেন একটু চিন্তা করে বললে, জানেনই তো কথায় বলে বিধবা মেয়ের সর্ব্বনাশ বাপ-ভাইতে করে। কথাটা অপ্রিয়। কিন্তু সংসারী লোক সব দিক ভেবে চিন্তে কাজ করে।

—তাহ'লে তুমি কি জমি বেচতে বলছ না?

—জমি বেচতে বলছি, কিন্তু টাকাটা হাতে রাখতে পাবেন না। অভাবের সংসার, হয়তো খরচ হয়ে যাবে। তখন মেয়েটা একেবারে পথে বসবে।

বেণীমাধব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

—নরেন তো ভালো কথাই বলছেন রামলোচন। এতো সত্যিই একটা ভাববার কথা। তাহ'লে এক কাজ তো করা যায় নরেন, তোমার ব্যাঙ্কেও তো টাকাটা রাখা যায়। মাসে মাসে সুদ যা আসবে,—

নরেন হেসে ফেললে।

বললে, টাকা তো খুব বেশী পাওয়া যাবে না কাকাবাবু। সুদ তার সামান্যই আসবে। তাতে কিছুই হবে না। ওই টাকা দিয়ে ওই পরিমাণ জমি আমি এইখানেই কিনে দোব।

উৎসাহে বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে উঠলেন।

এই হ'ল জমিদারী মাথা! রামলোচন, শুনলে তো বুদ্ধিটা?
—ওর জে মাথায় আসবে কোত্থেকে? বেঁচে থাকো বাবা, দীর্ঘজীবি
—ওর ক্ষ্মী তোমার সংসারে অচলা হোন। তোমার উপরই ভার
দাম হয়তো। যাতে অভাগীর ভালো হয় তাই করো।
বাঁচবে। পুনঃ নানা ভাষায় আশীর্ব্বাদ করতে করতে বেণীমাধব চ'লে গেলেন।

রামলোচন বললে, বড় ভালো লোক, বড়বাবু। এ ধরণের লোক ক্রমেই কমে যাচ্ছে। আর বড় দেখতে পাওয়া যায় না।

সেইদিন দুপুরেই গায়ত্রী এল বাবুদের অন্দরে।

মহেন্দ্র চলে যাবার পরে গ্রামময় এমন একটা বিশ্রী কলঙ্ক ওদের দু'জনকে জড়িয়ে উঠেছিল যে গায়ত্রী বাইরে বেরুনো এক প্রকার ছেড়েই দিয়েছিল। একে তো কলহ করা তার স্বভাব নয়, তার উপর এটুকু সে বুঝেছিল যে, এসব ব্যাপারে কলহ করায় লাভের চেয়ে লোকসানই হয় বেশী। তাই সকলকে এড়িয়ে সে নিজের গৃহকোণে কাজ নিয়েই মগ্ন থাকতো।

কিন্তু আজ আর পারলে না।

সুবর্ণর কাছে এসে দাঁড়াতেই সুবর্ণ ওকে জড়িয়ে ধরে বললে, আসিস নি যে এতদিন? শরীর কি ভালো ছিল না?

গায়ত্রীকে অত্যন্ত ক্লান্তই দেখাচ্ছিল।

বললে, শরীর ভালোই ছিল বৌদি। কাজের ভিড়ে আসতে পারিনি। আজ একটা বিশেষ দরকারে পড়েই এলাম।

দরকারের নামে সুবর্ণর মুখটা গম্ভীর হ'ল। অভাবগ্রস্ত লোক দরকারেব কথা বললে সবাই ভয় পায়। গায়ত্রীর উপর সুবর্ণর একটা অকৃত্রিম স্নেহ আছে সত্য। তবু তারও মুখ গম্ভীর হয়।

গায়ত্রী বললে, নরেনদা আমার শশুরবাড়ীর জমিগুলো সম্বন্ধে বাবাকে কি পরামর্শ দিয়েছেন শুনেছ ?

দরকারটা টাকার নয় শুনে সুবর্ণ খানিকটা আশ্বস্ত হল।

বললে, না, শুনিনি তো।

—পরামর্শ দিয়েছেন, সেখানকার জমিগুলো বিক্রী করে এখানে জমি কিনতে।

—এ তো ভালোই পরামর্শ গায়ত্রী।

গায়ত্রী মাথা নেড়ে বললে, হ্যাঁ, পরামর্শ ভালোই। কিন্তু এতে আমার মন সায় দিচ্ছে না। সেই কথাটাই তোমাকে বলতে এলাম ও জমি বিক্রি করতে আমার মন নেই।

—কিন্তু ও জমি তো তোর কোনো কাজেই আসে না গায়ত্রী। তো ও থেকে আজ পর্যন্ত একটা দানা ধানও পাস নি। ও জমি রেখে লাভ কি হবে?

—এ লাভ-লোকসানের কথাই নয় বৌদি। কিন্তু তুমিই বলো, ও জমি আমি বিক্রি করব কোন্ অধিকারে?

সুবর্ণ একটু চিন্তা করে বললে, কিছু একটা অধিকার আছে নিশ্চয়ই। উনি আইন জানেন। আইনে হারবি জানলে উনি তোকে সে পরামর্শ কখনই দিতেন না।

—আইনে!—গায়ত্রী হাসলে,—আইনের কথা, আমি মুক্ষু মেয়েমানুষ, কিছুই বুঝি না। কিন্তু কি সুবাদে ওঁদের জমি দখল করব আমি? যাঁর সুবাদে অধিকার, তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ই হয়নি যে।

কথাটা যে সত্য তা সুবর্ণ জানতো।

গায়ত্রীর বর যখন বিয়ে করতে এলো তখনই প্রবল জ্বরে কাঁপছে। বিয়ের পর বাসরটা কাটালে লেপ মুড়ি দিয়ে। বয়স হয়েছিল, তার উপর ম্যালেরিয়া জ্বর। সোজা ব্যাপার তো নয়। এমনি করেই কাটে ফুলশয্যার

রাত। তার পরেই তো গায়ত্রী বাপের বাড়ী ফিরে এল। এবং ছ'টা মাসও গেল না, বিধবা হল।

সুবর্ণ গায়ত্রীর সমবয়সী নয়। কিন্তু-বয়সের ব্যবধানে মেয়েদের সখিত্ব কোনো কালেই আটকায় না। বৌদি সুবাদে গায়ত্রীর সঙ্গে সুবর্ণর সখিত্বই গড়ে উঠেছিল। গায়ত্রীর খবর গ্রামের সকল মেয়েই জানতো। সুবর্ণ আরও বেশিই জানতো।

তথাপি বললে, তবু ওই একটি দিনের মন্ত্রপড়া ভাই, ওর মূল্য কি কম? আমাদের জোর তো স্বামীর ঘর করবার সময়ের উপর নির্ভর করে না ভাই, আমাদের জোর ওই মন্ত্রের জোর।

গায়ত্রী বললে, কি জানি বৌদি, কিসের জোর। কিন্তু ওই জমি-বিক্রির টাকা হাত পেতে নিতে হবে ভাবতেই আমার বুক কেঁপে উঠছে। ও আমি পারব না বৌদি।

সুবর্ণ একটুক্ষণ নিঃশব্দে ওর দিকে চেয়ে থেকে বললে, তাহ'লে তোর চলবে কি ক'রে ভেবে দেখেছিস? বাপের ওই তো অবস্থা! তবু তিনি যতদিন বেঁচে আছেন, একবেলা এক মুঠো তোর জুটবেই। কিন্তু ভায়েরা যদি খেতে না দেয়?

—তখন যে কি করব ভাবিনি বৌদি। তোমাদের পাঁচ বাড়ীতে ভিক্ষে করেও যদি পেট না ভরে, নদীতে তো জল আছে। সে ভাবনা তখন ভাবব। কিন্তু এখন,

গায়ত্রী দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়লে।

বললে, তোমাকে সমস্তই ব'লে গেলাম নরেনদাকে তুমি একটু বোলো বৌদি, বাবাকে বুঝিয়ে বলতে। তাঁর অভাবের সংসার। জমি-বিক্রির জন্যে লোভ হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু নরেনদা বুঝিয়ে বললে, নিশ্চয় তিনি শান্ত হবেন। বলবে বৌদি?

বিষণ্ণমুখে সুবর্ণ বললে, বলব। কিন্তু কাজটা তোর ভালো হচ্ছে না ভাই। শেষে পস্তাবি।

গায়ত্রী হেসে বললে, পস্তাচ্ছি তো গোড়া থেকেই বৌদি। এর যে একটা শেষ আছে, আজকে ভাবতেও পারি না।

—তাহ'লে এই তোর মত?

—হ্যাঁ।

সুবর্ণ আর কিছু বললে না।

গায়ত্রী আরও কিছুক্ষণ ব'সে এটা-ওটা আরও পাঁচটা হাসি-পরিহাসের পর একসময় উঠে চলে গেল।

ষোল

হিতৈষী যারা তারা সবাই গায়ত্রীকে বোঝালে। কিন্তু কিছুতেই তাকে বোঝানো গেল না।

বেণীমাধবের সম্পত্তি অতি সামান্য। তাতে কায়ক্লেশেও দু'টা মাসের বেশী চলে না। বড় দুটি ছেলে কিছু কিছু পাঠাতে পারে ব'লেই নুন-ভাতটা সম্বৎসর চলে যায়। কিন্তু বেণীমাধবের অবর্তমানে তার হবে কি? বিধবার অঢেল পরমায়ু। তার জীবনটা চলবে কি ক'রে?

গায়ত্রী বলে, বাপের সম্পত্তিতেই আমার যদি অধিকার না থাকে শ্বশুরের সম্পত্তিতে আরও অধিকার নেই।

রেগে হিতৈষীরা বললে, মেয়েটা বোকা এবং জেদী।

গায়ত্রী তাতে রাগ করলে না। নিজের কাজে চ'লে গেল।

সে জানে, এরা কেউ তাকে বুঝবে না। যুক্তি-তর্কের কথাই এটা নয়। কিছু জানে মহেন্দ্র। শুধু তারই কাছে একদিন রাগের মাথায়, ঝোঁকের

মাথায় সে বলে ফেলেছিল, স্বামী মারা না গেলে আত্মহত্যা করা ছাড়া তার উপায় ছিল না। তার মানে মহেন্দ্র ঠিক্ ঠিক বুঝেছে কি না কে জানে। হয়তো ওদের মতো মহেন্দ্রও তাকে ভাবেব বোকা এবং জেদী। সেও হয়তো বুঝবে না, স্বামীর সম্পত্তি গ্রহণ করা কেন গায়ত্রীর পক্ষে অসম্ভব।

মেয়েমানুষের মনকে দার্শনিকেরা অরণ্যের সঙ্গে তুলনা ক'রেছেন। অরণ্যই বটে। বাইরে থেকে জটিল এবং দুরধিগম্য। ভিতরে গেলে অরণ্যকে আর দেখা যায় না।

দ্বাদশীর দিন।

সকাল সকাল স্নান ক'রে গায়ত্রী ভিজে কাপড়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী ঢুকলো। শীত পড়েছে ভীষণ। বারান্দায় দড়ির উপর জীর্ণ মটকার শাড়ীখানি কোঁচানো রয়েছে। তাড়াতাড়ি সেইটে প'রে গায়ত্রী উঠানে এসে দাঁড়ালো।

কিন্তু দাঁড়াতে সে আর পারছে না। আগের দিন একাদশী গেছে। নিরম্বু উপবাস। গায়ত্রীর শরীর যেন টলছে।

ডাকলে, মাগো!

উঠানের এক কোণে তার ছোট ভাইটি নিবিষ্ট মনে মাটির গরুকে ঘাস খাওয়াচ্ছিল।

বললে, মা তো নেই দিদি। এখনি যেন কোথায় গেল।

—কোথায় গেল?

—কি জানি।

গায়ত্রী রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে দেখলে, মা নেই। মেঝেয় দ্বাদশীর পারণও সাজানো নেই। পারণ আর কি! প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর কন্যা হ'লেও দরিদ্রের সংসারে সমারোহের সাধ্য নেই। গাছে শসা থাকে দু'কুচি শসা, কি দুটি মুগের ডাল ভিজে, একখানা বাতাসা, কি একখানা পাটালী, কি

মুড়ি থাকলে দুটি মুড়ি। সকাল সকাল মেয়েকে স্নান করতে পাঠিয়ে তাই নিয়ে মা ব'সে থাকেন। মেয়েকে খাইয়ে রান্নাঘরে গিয়ে চোখের জল মোছেন।

মা দেখেছেন, মেয়ে স্নান করতে গেল। মটকার শাড়ীখানি কুঁচিয়ে রেখেও গেছেন। বড় ঘরে ঢুকে গায়ত্রী দেখলে, আহ্নিকের ঠাঁই করাও আছে! শুধু মা নেই।

গায়ত্রী আপন মনেই হেসে আহ্নিক করতে বসলো।

এমন আরও কতদিনই হয়েছে। মেয়েকে স্নানে পাঠিয়ে পারণের জন্যে কিছুই খুঁজে পাননি মা। পালিয়েছেন বাড়ী থেকে। আর কোথাও নয় ঘাটে। কারো বাড়ী চাইতে যাওয়ার অভ্যাস এ পরিবারে কারো নেই। মা চ'লে যান ঘাটে। মেয়ে রেঁধে-বেড়ে মাকে ডেকে নিয়ে আসে। চোখের জল মুছে মা ফিরে আসে। বেণীমাধব এবং ছেলেদের খাওয়া তখন হয়ে গেছে। মা-মেয়েতে বেলা তৃতীয় প্রহরে পাশাপাশি বসে দুটি খায়।

যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে গায়ত্রী কত গল্প করে। মা কখনও সাড়া দেন, কখনও দেন না। সেদিনের পর্ব এমনি ক'রেই শেষ হয়। কিন্তু গায়ত্রীর মনে প্রশ্ন ওঠে অনেক রকম।

মহেন্দ্রের কাছে গায়ত্রী অসঙ্কোচেই হাত পেতেছে একদিন। তার মনেই হয়নি টাকাটা ভিক্ষা নেওয়া হ'ল। অথবা উদারতায় মহেন্দ্র তাকে দান করলে। ওই মহেন্দ্রই তাকে মরা বাঁচিয়েছে একদিন। তাকে ফি দেওয়া হয়নি, ওষুধের দাম পর্যন্ত না। দিনরাত্রি জেগে শুশ্রূষা করেছে তাকে। অথচ একটা দিনের জন্যেও মনে হয়নি, এর জন্যে মনে-মনেও কৃতজ্ঞতা জানানো আবশ্যক। কৃতজ্ঞতাও একটা ব্যবসা। দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার। গায়ত্রীর মনে সে প্রশ্ন ওঠেওনি।

আবার এই গায়ত্রীই একদিন দম্ভভরে মহেন্দ্রকে শুনিয়েছে, তার কাছে

কোনো প্রত্যাশাই সে রাখে না। অথচ মনের কোণে কোথাও কি কোনো প্রত্যাশা সত্য সত্যই নেই? মহেন্দ্রের ভরসাতেই সে কি স্বামীর সম্পত্তি ত্যাগ করতে যাচ্ছে না?

গভীর রাত্রি।

ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে গায়ত্রী ভাবছে। জীর্ণ তক্তপোষে বৃদ্ধ পিতা নিদ্রিত। নিচে মেঝেয় একটা শতচ্ছিন্ন বিছানার ওপাশে মা, এপাশে মেয়ে, মধ্যে দুটি ভাই,—একখানি কাঁথায় ঘেঁষাঘেষি শুয়ে। ঘুমের ঘোরে ভাই কাঁথা টেনে নিচ্ছে বার বার। কুঁড়েমি ক'রে নিজের অংশ সে টেনে নিতে পারছে না। অথচ ঘুম ও আসছেনা শীতে।

শুয়ে শুয়ে গায়ত্রী শুধু ভাবে।

ভাববার বয়স তার নয়। হয়তো এলোমেলো ভাবে। কিন্তু দুঃখের চাপে এই বয়সেই সে ভাবতে শিখেছে।

নিজের মন তন্ন তন্ন ক'রে সে খুঁজে দেখছে। নিশ্চয় ক'রে সে বলতে পারে, ভগবান ছাড়া কারও ভরসা সে করে না। মহেন্দ্রের না, অন্য কোনো মানুষেরও না।

এই মহেন্দ্র ইচ্ছা করলে তাকে সবই দিতে পারত। কিন্তু পারেনি। তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে নিজে পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করেছে। তার উপরে ভরসা কোথায়? সত্য বটে মহেন্দ্র তাকে মরা বাঁচিয়েছে। কিন্তু কে বাঁচাতে সেধেছিল? মৃত্যুর চেয়ে শীতল কোল এই তরুণী কোথায় পাবে? মৃত্যুই কি তার ভালো ছিল না?

তারপরে এই কলঙ্ক?

মৃত্যুর বিনিময়ে যে কলঙ্ক মহেন্দ্র তার ললাটে মাখিয়ে গেছে, সে ধোবার মতো জল অতবড় নদীতেও বুঝি নেই।

চোখ জ্বালা ক'রে ওঠে গায়ত্রীর।

পাশের ছোট ভাইটি ক্ষীণকণ্ঠে ডাকলে, দিদি!

রাত তখন দুটোর কম নয়।

এই সময়ে ও যে আজ ডাকবে গায়ত্রী জানতো। রাত্রে খাবার ছিল সামান্যই। ওদের পেট ভরেনি। গায়ত্রী জানতো, রাত্রে ওর ক্ষুধা পাবে, ঘুম ভেঙে যাবে, ডাকবে দিদিকে।

দিদি তাকে আদর ক'রে বুকে টেনে নিলে।

বললে, ঘরে কিছুই ত নেই ভাই। একটু জল খাবি?

ভারি শান্ত ছেলে। এই বয়সেই সংসারের দুঃখ বুঝতে পেরেছে।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, খেজুরের গুড় নেই?

—না ভাই।

—ওদের বাড়ীর সত্যি নারায়ণের পেসাদ পাঠায় নি আজ?

—কই পাঠায়নি তো আজ?

—মুড়ির মোয়া?

—তাও নেই।

—কিছুই নেই দিদি?

—কিছুই নেই ভাই। আমি মিথ্যে কথা বলি কখনও?

—না।

—তবে?

ছেলেটি শান্তকণ্ঠে বললে, তবে একটু জল দাও।

মাথার শিয়রে ছোট একটা ঘটিতে জল ঢাকা ছিল। তাই খানিকটা ঢক ঢক করে খেয়ে ছেলেটা শুয়ে পড়ল। গায়ত্রীর চোখ আর একবার জ্বালা ক'রে উঠলো।

সকালে উঠে গায়ত্রী চুপি চুপি গোলককে ডাকতে পাঠালো। গোলকই ওর বিপদের কাণ্ডারী।

গোলক আসতেই গায়ত্রী সহাস্তে অনুযোগ করলে, আর যে বড় আসো না গোলক দাদা ?

গোলক বললে, মাঠে কাজ পড়েছে দিদি, তাই আর আসতে পারি না।

—আজ মাঠে যাও নি ?

—আজ আর যেতে পারলাম না দিদিমণি। কাল রাত্রে একটু জর হয়েছিল।

কতক ধান কাটার খাটুনির জন্তে, কতক ম্যালেরিয়ার জন্তে তার শরীরটা খুবই কাহিল দেখাচ্ছিল।

সহানুভূতির সঙ্গে গায়ত্রী বললে, আহা, তাইতো! মুখখানি যে তোমার একেবারেই শুকিয়ে গেছে গোলকদাদা। আজ আর তুমি রেঁধো না। এইখানেই ছুটি প্রসাদ খাবে। বেশ ?

গোলক সানন্দে বললে, সেই ভালো দিদি। আজ আর সত্যই রাঁধতে পারব না।

—কিন্তু তোমাকে যে একটি কাজ করতে হবে দাদা।

গোলক আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। সেইখানে কুলতলায় উবু হয়ে মাথাটাকে দুহাতে ধ'রে বসলো। বললো, বলো।

ওর শরীরের অবস্থা দেখে গায়ত্রী একটু দ্বিধা করলে। বললে, তোমার শরীরের অবস্থা দেখে যে বলতে পারছি না।

গোলক বললে, কাঠ-কাটার কাজ হয়তো এবেলা নয়, দুটো খেয়ে-দেয়ে ও বেলায় ক'রে দোব। আর হালকা কিছু হয়তো বলো।

পেট-কাপড় থেকে গায়ত্রী একটি ছোট্ট নাকচাবি বের করলে। এই তার শেষ সম্বল। বিয়েতে বাবা তাকে কিছুই দিতে পারেন নি। শুধু শাঁখা-সিন্দুর দিয়ে বিদায় করেছিলেন। বুড়ো বরের দাবীও তার উর্দ্ধে ওঠেনি। ভদ্রলোক নিতান্ত অবুঝ ছিলেন না। বিবাহের বয়স যে অনেকদিন পার হয়ে গেছে, সে বোধ তাঁর ছিল।

শুধু সন্তান লাভের লোভটা তাঁর প্রবল ছিল। পরপর দু'টি বিবাহ ইতিপূর্বে তিনি ক'রেছিলেন।

কিন্তু সন্তানাদি কারো হয়নি। বংশটা এমন কিছু সূর্যবংশ-চন্দ্রবংশ নয়। সম্পত্তিও মস্ত কিছু নয়। জমি-জিরাৎ, পুকুর-বাগান নিয়ে সম্পন্ন সাধারণ গৃহস্থ। এই সম্পত্তিটুকুই বংশধরের হাতে দিয়ে যাবার ব্যাকুলতায় আবার তিনি তৃতীয়বারের জন্যে বিবাহ করেছিলেন।

সুতরাং শাঁখা-সিঁদুরেই গায়ত্রীকে তিনি নিয়েছিলেন। নিজেই দিয়েছিলেন চুড়ি, হার আর কাণের দুল। সে সব অভাবের তাড়নায় কবে বিক্রি হয়ে গেছে। ছিল শুধু বিয়ের সময় মাসীর দেওয়া এই নাকচাবিটি।

কাকুতি ক'রে বললে, এইটি বেচে দিতে হবে দাদা। সামান্য জিনিস। তবে সোনার এখন দাম খুব, টাকা পনেরো পেতে পারো।

গোলক হাত বাড়ালে না। শুধু নিঃশব্দে ওরে দিকে চেয়ে রইল! বললে, চাল কি একেবারেই বাড়ন্ত?

গায়ত্রী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে।

গোলক বললে, বেশ! তার উপর আমাকেও খেতে বললে!

গায়ত্রী হাসলে।

গোলক বললে, তোমাকে বললে তো শুনবে না দিদি। কিছু না করে শুধু পুকুর-বাগানের অংশটা বেচলেও হাজার দুই টাকা পাও।

গায়ত্রী হেসে বললে, সেও তো আর এক্ষুণি পাচ্ছি না গোলক দাদা। কিন্তু চাল এখুনি চাই।

গোলক বললে, তা না হয় এনে দিচ্ছি। কিন্তু পাঁচ জন হিতকামীর কথা শোনো। কিছু বেচে দাও।

গোলক উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তখনই ধপ্ ক'রে ব'সে জোরের সঙ্গে বললে, কিম্বা এক কাজ করলেও তো পার। সেইখানে গিয়েই থাকো

গে। আমাকে শুদ্ধ নিয়ে চল। তোমার জমি-জিরেৎ দেখব, চাষ-বাস করব, ব্যস।

এমন চমৎকার একটা সমাধান হাতের কাছে পেয়ে গোলক উৎসাহে দুই হাতে চটাং করে একটা তালি দিলে।

গায়ত্রী বললে, আচ্ছা, সে পরামর্শ খাওয়া-দাওয়ার পরে হবে। এখন ওঠো দেখি।

গোলক উঠলো।

এবং যাবার জন্যে পা বাড়াতেই গায়ত্রী বললে, বাঃ! এটা নিয়ে যাও। ব'লে নাকচাবীটা দিতে গেল।

হাত নেড়ে গোলক বললে, ওসব রাখ। আমি বাগ্দীর ছেলে, সোনা বিক্রী করতে যাব কোথায়? চোর ব'লে পুলিশে ধরিয়ে দিক আর কি!

—তা হ'লে চাল পাবে কোথায়?

—সে ভাবনা তো তোমার নয় বাপু। সে আমি যেখান থেকে পারি নিয়ে আসছি।

এমনি করে বহুদিন গোলক এদের দুঃখের সংসার চালিয়ে দিয়েছে। সে কথা জানে শুধু গোলক আর গায়ত্রী।

কালকে খবরের কাগজে উপাধি বিতরণের তালিকায় মহেন্দ্র তার দাদার নাম দেখেছে। এবারে আর বঞ্চিত হয়নি। 'রায় বাহাদুর' উপাধি নরেন পেয়েছে।

আজ এল নরেনের টেলিগ্রাম:

সামনের রবিবারেই নরেন ভূরিভোজনের ব্যবস্থা করেছে। জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি তো আসবেনই, ম্যাজিষ্ট্রেটের মেমসাহেবেও আসবেন ব'লে কথা দিয়েছেন। নরেন জানিয়েছে, রামলোচন অথবা বিভূতি

কাউকে সে পাঠাচ্ছে। কলকাতা থেকে ভালো ভালো কেক-বিস্কিট, নতুন তরকারী এবং বিবিধ প্রকারের মিষ্টি নিয়ে সে যেন শনিবার সন্ধ্যার ট্রেনে নিশ্চয়ই আসে।

দাদার সেই সাহেব তোষণের নেশা!

খেতাবের নেশা নরেনর অনেক দিনের। সেই খেতাব অবশেষে যখন হস্তগত হয়েছে, তখন একটা সমারোহ না ক'রে সে যে ছাড়বে না, মহেন্দ্র তা সুনিশ্চিত ক'রে বুঝলে। বিভূতি অথবা রামলোচন কেউ একজন আসছেই। এবং শনিবার সন্ধ্যার ট্রেনে তাকেও বাড়ী যেতে হবে।

অথচ বহু অনুসন্ধান, চেষ্টা এবং সেলামীর নামে ঘুষের পরিবর্তে আজকেই তার ক্লিনিকের জন্যে ঘর পাবার ভরসা পেয়েছে। এখন টাকা দেওয়া এবং লেখা পড়া করা আছে, ক্লিনিকের যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র কেনা আছে। আরও অনেক কাজ আছে। এই সময় চ'লে যাওয়া মানেই কাজের ক্ষতি।

মহেন্দ্র বিব্রতভাবে বসন্তকে বললে, ওহে আমি তো এক ভীষণ ঝামেলায় পড়লাম।

—ঝামেলা আবার কি?

—দাদা রায় বাহাদুর হয়েছেন।

—সে আর ঝামেলা কি! একদিন চল গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে গিয়ে আনন্দ ক'রে আসা যাক।

মহেন্দ্র মাথা চুলকে বললে, আনন্দের অভাব হবে না হে। দাদা আমার আনন্দময়। কিন্তু মুস্কিল এই যে আনন্দটা করতে হবে দেশে গিয়ে।

পেনিলোপী ওদিকের জানালার পাশে বসে বসন্তর একটা ছেঁড়া মোজা সেলাই করছিল। ওদের কাছে উঠে এসে বললে, সে তো আরও ভালো। কিন্তু আমাদের নিমন্ত্রণ আছে তো?

মহেন্দ্র উল্লাসে লাফিয়ে উঠলো। বললে, The idea! যাবে তোমরা? ব'লে উৎসুক দৃষ্টিতে পেনিলোপীর দিকে চাইলে।

পেনিলোপী বললে, ওঁর কথা জানিনে। কিন্তু নিমন্ত্রণ থাকলে আমি নিশ্চয় যাব। গ্রাম দেখার ইচ্ছা আমার ভয়ানক।

বসন্ত বললে, কিন্তু ক্লিনিক?

মহেন্দ্র বললে, সেই তো সমস্যা। সামনের শনিবার যেতে হবে। রবিবারে সমারোহ। কিন্তু সোমবারেই যে দাদার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে এমন ভরসা দিতে পারি না।

বসন্ত মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি করবে?

—আমাকে যেতেই হবে। নইলে ভয়ানক দুঃখ পাবেন তিনি।

বসন্ত চিন্তিতভাবে বললে, তাই তো, হে! কিন্তু দুজনে এই সময় গেলে চলবে কি করে?

পেনিলোপী ওদের দুজনের মাঝখানে ব'সে বললে, দাঁড়াও। আমি তোমাদের সমস্যার মীমাংসা ক'রে দিচ্ছি।

স্বামীর দিকে ফিরে পেনিলোপী জিজ্ঞাসা করলে, দুজনের যাওয়া কিছুতেই কি সম্ভব নয়?

—উহুঁ।

—আর তোমাকে যেতেই হবে মহিন?

—নিশ্চয়।

—কবে ফিরবে তার ঠিক নেই?

—না, তা নয়। তিনি নিজেও কাজের লোক। হয় তো দু'এক দিন দেরী হবে। যাবে তুমি?

—তোমাদের অসুবিধা কিছু হবে না তো?

—আমাদের মানে দেশের বাড়ীর কথা বলছ তো? না, কিছুমাত্র অসুবিধা হবে না।

স্বামীর দিকে চেয়ে পেনিলোপী জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি বলো? যাব মহিনের সঙ্গে?

বসন্ত খুশি হয়েই বললে, ঘুরে এসো না ওর সঙ্গে। বাংলাদেশের পাড়াগাঁ দেখা হবে।

—আর তোমার সেই তরুণীটিকে দেখাবে না মহিন? আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে তো?—পেনিলোপী জিজ্ঞাসা করলে।

মহেন্দ্র বললে, দেখাব নিশ্চয়ই। কিন্তু আলাপ করিয়ে দেবার সুযোগ পাব কি না জানি না।

—কেন? খুব পর্দানশীন?

—গ্রামের মেয়ে পর্দানশীন বলা ঠিক হবে না। তবু কিছু অসুবিধা আছে। কিন্তু আমাদের পল্লীসমাজের কথা তুমি সেখানে না গেলে বুঝতে পারবে না।

পেনিলোপী বললে, বেশ, আমি যাব। দেখেই আসি বাংলাদেশের গ্রাম আর গ্রামের মেয়ে। অবশ্য তোমার অনুমতি নিয়ে বসন্ত।

বসন্ত ওকে উৎসাহ দিয়ে বললে, যাও। দেখে এস। বাংলা দেশের সত্যিকার পরিচয় রয়েছে গ্রামে। হয়তো সব দেশেরই তাই। তবে বাংলার যেন বিশেষ ক'রে। এখন তো বাংলা কথা বলতে মোটামুটি শিখেছ। কিছু অসুবিধা হবে না তোমার।

পেনিলোপী খুশি হয়ে বললে, তাহ'লে এই কথাই রইল। শেষটা আমাকে ফেলেই যেন পালিয়ে যেও না মহিন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রামলোচন এল।

মহেন্দ্র বললে, এই যে এসে গেছ! কিন্তু এলে কি ক'রে রামলোচনদা?

বিস্মিতভাবে রামলোচন বললে, কেন ট্রেনে।

মহেন্দ্র হেসে বললে, সে আমি জানি। আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করি নি।

—তবে ?

—আজ বিষ্যুদ বার না ? দাদা তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ওলট-পালট হয়ে গেলেও বিষ্যুদ বারে নিজেও বেরোন না, অন্য কাউকেও পাঠান না। আমি তো জানি।

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে রামলোচন হেসে ফেললে। বললে, সে কথা আর বলবেন না ছোটবাবু, বুধবার বিকেল থেকে আমি বাড়ী ছাড়া। রাত কাটিয়েছি বাগান বাড়ীতে।

—তাই বলো। এখন ফর্দ কি রকম এনেছ রামলোচনদা? কলেবরটা একবার দেখি।

—সেটা আমি ঠিক দেখিনি ছোটবাবু। বড়বাবু খামে ক'রে দিলেন, হাত পেতে নিলাম। বেশ পুরুষ্টু বলেই মনে হ'ল। ফর্দ নিতান্ত কম বোধ হয় হবে না।

—তাহ'লে কাল সকাল থেকেই বেরুতে হবে বল।

—আজ্ঞে, তা হবে বই কি! বলতে গেলে কালকের দিনটাই যা সময়।

—আচ্ছা, তা'হলে তুমি হাত মুখ ধুয়ে নাও। এখানে খাওয়ার অসুবিধা আছে। তোমার জন্যে বাজার থেকে কিছু খাবার আনিয়ে দিই। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়। কি বল? রাজসূয় যজ্ঞের ফর্দ কাল সকালে বরং দেখা যাবে।

রামলোচন ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, ছোটবাবু, খাবার মানে লুচি মিষ্টি তো?

—নিশ্চয়।

হাত জোর করে রামলোচন বললে, আজ্ঞে ওইটি, পারব না। রাত্রে পেটে দুটি ভাত না পড়লে আমার ঘুমই হবে না। কথায় বলে, ভেতো বাঙালী! হাঃ! হাঃ! হাঃ!

মহেন্দ্র চিন্তিতভাবে বললে, তবেই তো মুস্কিল করলে রামলোচনদা। আমি নিজে খাই উপরে আমার এক বন্ধুর কাছে। সে তোমার চলবে না। তা'হলে কি হোটেলে খাবে?

—বামুনের হোটেল তো?

—আশা করা যায়। তবু পৈতেটা একবার দেখে নিও।

—যে আজ্ঞে। আপনার চাকর আছে তো?

—আছে।

—হিন্দু?

—হ্যাঁ।

—সে কোথায় খায়?

—হোটেলেই খায়, কোনো কোনো দিন নিজেও রাঁধে।

—তাহ'লে আমি হাত মুখ ধুয়ে তাকেই নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। এক সঙ্গে খেয়ে দেয়ে ফিরব।

—তাই করো।

খবরটা জানাতে মহেন্দ্র উপরে গিয়েছিল। খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘণ্টা-খানেক পরে নিচে নেমে এসে দেখে, তার শোবার ঘরে দুই হাঁটুতে মুখ ঢেকে রামলোচন ব'সে। অদূরে দেওয়াল ঘেঁষে মহেন্দ্রের চাকরটাও দাঁড়িয়ে।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, পেট ভরেছে রামলোচন দা?

—আজ্ঞে না।

—সে আবার কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। খেতে বসতে যাব দেখি আমাদের গাঁয়ের নিবারণ পরিবেশন করছে।

—নিবারণ কে ?

—আজ্ঞে জটাই বায়েনের ছেলে। দুর্ভিক্ষের সময় কলকাতা এসেছিল, আর ফেরেনি। ভেবেছিলাম মরেই গেছে বোধ হয়। দেখি বেঁচেই আছে। চেহারা বেশ একটু চিকণ হয়েছে, রংটাও ফর্সা হয়েছে। গলায় ইয়া পৈতের গোছা।

মহেন্দ্র সবিস্ময়ে বললে, বলো কি হে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। নিজের চোখে দেখে এলাম। আমাকেও দেখলে সে। দেখেই যে কোথায় স'রে পড়লো আর পাত্তা পেলাম না। ভাগাড়ের দরুণ এখনও খাজনা পাওনা আছে তিন টাকা ছ'আনা আট পাই।

—তারপরে ?

—তারপরে আর কি বাবু! আমার তো খাওয়া হ'লই না, ও ছোকরারও না। বলছে, আজ আর কিছু খাবে না। কাল সকালে গঙ্গা নেয়ে প্রাচিত্তির করবে। রাঁধে কেমন হে ?

ছেলেটা সলজ্জভাবে বললে, তা ভালোই। রাঁধে আজ্ঞে বিশুদ্ধ বেরাহ্মণের মতোই।

কৃত্রিম উৎসাহে রামলোচন বললে, বাঃ! বাঃ:! তাহলে খেলে হ'ত, কি বল ?

ছোকরা হাসলে। মহেন্দ্রও না হেসে পারলে না। বললে, তা তো হ'ল রামলোচন দা! কিন্তু রাত্রে তাহ'লে খাবে কি ? কিছু চিঁড়ে, দই, কলা আর রসগোল্লা নিয়ে আসুক। তাইতেই তোমরা দুজনে আজকের রাতটা কোনো রকমে কাটাও। কি বল ?

—আজ্ঞে সেই ভালো। ক্ষিদেও পেয়েছে প্রচুর। রান্নার আয়োজন না করাই ভালো। কাল দিনের বেলায় সে ব্যবস্থা করা যাবে। কি বল হে ছোকরা ? কি নামটি তোমার বললে ভালো ?

—আজ্ঞে বনমালী।

—বেশ, বেশ। তাই কর বনমালী, বাজার থেকে চটপট যা-হোক কিছু নিয়ে এস। তারপর কাল দুপুরে তোমাকে এমন মুগের ডালে মুড়িঘন্ট খাইয়ে দেবো যে, জীবনে ভুলতে পারবে না। যাও।

কিন্তু বনমালী চলে যেতেই রামলোচন ব্যস্ত ভাবে উঠে বসলো :

—ছোটবাবু!

—বলো।

—এ ব্যাটাও আবার নিবারণের মতো নয় তো ?

সে বিষয়ে মহেন্দ্রও সুনিশ্চিত নয়। কিন্তু বললে, না, না, ও বড় ভালো জাত। ওর আত্মীয় স্বজন সব আসে তাদেরও দেখেছি যে। বেশ দেখতে!

—আমাদের ক'লকাতা শহরে আসা একটা ঝকমারী ছোটবাবু। খাই-দাই তবু মনটা খুঁৎ খুঁৎ করে। বিভূতিকে বললাম, তুমিই যাও বাপু, বুড়ো মানুষকে কেন আর কষ্ট দাও। আসতও সে। কাল রাত থেকে এমন জ্বরে পড়লো যে আর কিছুতেই পারলে না।

—বিভূতির জ্বর বুঝি ?

রামলোচন এ প্রশ্নের আর জবাব দিলে না। মনটা তার খিঁচিয়ে গিয়েছিল। ক্ষুধা সে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। বিরক্তভাবে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে সেইখানে কম্বলের উপরই শুয়ে পড়লো।

মহেন্দ্র আর কিছু না ব'লে পড়বার ঘরে গিয়ে একখানা বই খুলে পড়তে আরম্ভ করলে।

আহারাদি ক'রে পরিতৃপ্তির সঙ্গে রামলোচন মহেন্দ্রের শোবার ঘরের মেঝের উপর বিছানা পাততে বসলো।

মহেন্দ্র বললে, ওঘরে কিন্তু শোবার জায়গা ছিল রামলোচনদা।

—তা হোক। এই বেশ শোব।

মহেন্দ্রের হঠাৎ মনে পড়ে গেল কথাটা।

হেসে বললে, তোমার আবার ভূতের ভয় আছে, না রামলোচনদা? এ বয়সেও যায়নি সেটা?

রামলোচন লজ্জিতভাবে হেসে বললে, আজ্ঞে ঠিক ভয় নয়; তবে একলা থাকলে গা'টা কেমন ছমছম করে!

—আশ্চর্য রামলোচনদা! দিনে দাঙ্গা-ফৌজতে তোমার অসীম সাহস। অথচ রাত্রে···

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দিনে বাঘের সামনে ফেলে দিন, ভয় পাব না। কিন্তু রাত্রে···

রামলোচন আর একবার লজ্জিতভাবে হাসলে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে শুয়ে থেকে রামলোচন ডাকলে, ছোটবাবু?

—কি বলছ?

—কিছু কুনিয়ান যোগাড় ক'রে দিতে পারেন? গাঁ তো উজাড় হয়ে গেল।

—তবেই তো মুস্কিল করলে রামলোচনদা। কুইনিন তো পাওয়া যাচ্ছে না। গাঁয়ে কি খুব ম্যালেরিয়া আরম্ভ হয়েছে?

—অসম্ভব রকমের। লোক ম'রে শেষ হয়ে গেল।

মহেন্দ্র চিন্তিতভাবে বললে, তাইতো। অনেক লোক মারা গেল বুঝি?

—অনেক। আমাদের বাড়ুয্যে মশাইও দেহ রেখেছেন।

—বেণীকাকা?—মহেন্দ্র বিছানার উপর উঠে বসলো,—কবে মারা গেলেন? কী হয়েছিল?

—কি যে হয়েছিল বাবু, কেউ জানে না। ভুগছিলেন ক'দিন থেকে। হঠাৎ একদিন সকালে শুনলাম, মারা গেছেন। গরীব মানুষ, ডাক্তার তো আর ডাকতে পারেন নি। তা দিন কুড়ি হ'ল মারা গেছেন।

দিন কুড়ি! অথচ একটা কথাও কেউ তাকে জানাবার আবশ্যক মনে করেনি। কেনই বা করবে?

রামলোচন বলতে লাগল:

—বড় কষ্ট ওদের! বড় ছেলে দুটো পষ্ট বলে দিয়েছে, গায়ত্রীকে খেতে দিতে পারবে না। আর মেয়েটাও কি বোকা দেখুন, শ্বশুর বাড়ীর যে সম্পত্তি তার আছে তাতে একটা বড় সংসার ফেলে-ছড়িয়ে চলতে পারে। কিন্তু সেখান থেকে একটি দানাও সে পায় না। বড়বাবু বললেন, আমি বললাম, বাঁড়ুয্যে মশাই নিজে কত বললেন, শ্বশুরবাড়ীর জমি বিক্রি ক'রে দিয়ে আমাদের গ্রামে জমি কিনতে। তাতে মেয়েটার তো বটেই, বাঁড়ুয্যে মশায়ের গোটা সংসারটাও চলে যেত।

মহেন্দ্র সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, তা কি হ'ল?

বিরক্তভাবে রামলোচন বললে, হবে আমার মাথা আর মুণ্ডু। মেয়েটা না শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে থাকবে, না জমি বিক্রি করবে। খদ্দের পর্যন্ত যোগাড় ক'রে দিলাম। আমার শালা···

বাধা দিয়ে মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, বিক্রি করবে না কেন?

—কেন তা সেই জানে। বলে, ও জমিতে সত্যি সত্যি আমার কোনো অধিকার নেই। ও আমি ম'রে গেলেও ছোঁব না।

মহেন্দ্র নীরবে ভাবতে লাগলো।

রামলোচন বললে, করলে বটে গোলক! বাগদীর ছেলে, কিন্তু ও যা করলে তা স্বজাতিতেও করতে পারে না। বড় ছেলেটা যখন মেয়েটাকে বললে, তুমি ভাই পথ দেখ, তোমার ভার নিতে আমি পারব না। ও এগিয়ে এল। বললে, কিছু তুমি ভেবো না দিদিমণি, আমি তোমার ভার নিলাম। বাগদীরা বিধনা বুনকে ফেলে না। আমি তোমাকে মাথায় ক'রে রাখব। বললে, মালোয়ারীতে কাবু করেছে দিদি, বয়সও হয়েছে, নইলে লাঠির জোরে তোমাকে রাজার রাণী ক'রে রাখতাম। তা সে আর হবে

না দিদি। দুঃখ-ধান্ধা ক'রে দুই ভাই-বোনে কোন রকমে থাকব। তুমি রাঁধবে,আর আমাকে প্রসাদ দেবে। বলে আর সে কী কান্না দাদাবাবু! বাগদীর জোয়ান, উঠানময় যেন আছাড়ি-পিছাড়ি করে। বড় ছেলেটাকে বললে, তোমাদের আমরা কিছু চাইনে বড় দাদা, শুধু দিদিকে আমার মাথা গোঁজবার একটু ঠাঁই দিও।

মহেন্দ্রের বুকের ভিতর থেকে একটা বাষ্প যেন কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলে-ঠেলে উঠতে লাগলো।

সামলে নিয়ে অনেকক্ষণ পরে মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, তাহ'লে গোলকই ওকে দেখাশুনা করছে?

রামলোচন বললে, না ছোটবাবু, তাও না। মেয়েটা দেখতে ওই রকম, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভয়ানক শক্ত। সে আপনাদের বাড়ীতেই চাকরী নিয়েছে।

মহেন্দ্র চমকে উঠলো:

—আমাদের বাড়ীতে? কি চাকরী?

—কি চাকরী আর করবে বাবু! হিন্দুস্থানী বামুনটা মাস কয়েকের জন্যে দেশে চ'লে গেল। ওই এখন রাঁধছে। তা সুবিধাই হয়েছে ছোটবাবু। মায়ের রান্নাটা বৌদিকেই রাঁধতে হ'ত। তিনি তো আর ওই হিন্দুস্থানীটার হাতে খেতে পারতেন না। এখন মেয়েটা সব রান্নাই রাঁধে। তা রান্না শিখেছিল বটে বাবু! বড়ি দিয়ে বেগুন দিয়ে টকটি রাঁধে, যেন অমৃত!

দুজনে কেউ আর কোনো কথা বললে না।

রাত তখন অনেক। মহেন্দ্র ডাকলে, রামলোচনদা, ঘুমুলে নাকি?

ভয় ঠিক নয়, কিন্তু রাত্রি বেলায় রামলোচনের গা'টা কেমন ছমছম করে। মহেন্দ্রের আহ্বানে ধড়মড় করে সে উঠে বসলো। সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার!

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, থাকে কোথায় ?

—কে ?

—বাঁড়ুয্যেদের মেয়েটা ?

নিশ্চিন্তমনে রাগ মুড়ী দিয়ে পুনরায় শোবার আয়োজন করতে করতে রামলোচন বললে, থাকবে আর কোথায় বাবু, আমাদের বাড়ীতেই থাকে। ভাইটা তো জায়গা দিলে না। আর তাদের জায়গাই বা কই ? একটি তো মোটে ঘর, আঁর চালায় রান্না করে। সেও এইবার বিয়ে-থা করবে, তারও এইবার ঘরের দরকার হবে। তাকেও তো দোষ দেওয়া যায় না।

তা ঠিক। সে নিয়ে মহেন্দ্র আর তর্ক করলে না। রামলোচন নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে আরম্ভ করলে। কিন্তু তার চোখে আর ঘুম এলো না।

আঠার

দেশে যাবার ইচ্ছা মহেন্দ্রের চ'লে গিয়েছিল। কিন্তু নিতান্তই না গেলে নয়, তাই যাওয়া। দাদার হুকুম তো আছেই, তার উপর পেনিলোপীকে কথা দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং নির্দিষ্ট সময়ে পেনিলোপী আর রামলোচনকে নিয়ে মহেন্দ্র বেরিয়ে পড়লো। জিনিসপত্র লট-বহর অনেক। ষ্টেশনে মোটর এবং গরুর গাড়ী দুইই এসেছিল। মহেন্দ্র পেনিলোপীকে নিয়ে মোটরে বেড়িয়ে পড়লো। রামলোচন রইলো। সমস্ত জিনিসপত্র গুণে-গেঁথে হিসাব করে গরুর গাড়ীতে বোঝাই ক'রে পরে আসবে।

মহেন্দ্রের মোটর যখন বাগানবাড়ীতে পৌঁছুলো তখন বেশ অন্ধকার হয়েছে।

পেনিলোপীর যাওয়ার খবর মহেন্দ্র টেলিগ্রাম ক'রে আগেই দাদাকে জানিয়ে দিয়েছিল। সেজন্যে নরেন নিজেই তাকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য বাগানবাড়ীতে উপস্থিত ছিল।

মোটর থেকে নেমেই মহেন্দ্র 'রায় বাহাদুরীর' প্রথম উন্নতি দেখলে রাম সিংহের রীতিমতো গরম মিলিটারী পোষাক। মাথায় পাঞ্জাবী পাগড়ী, কাঁধে বন্দুক। আর ইব্রাহিমের পরণে পায়জামা, গায়ে নীল বনাতের আচকান। এই দুর্দিনে ওই দুর্লভ বস্তু নরেন কোথা থেকে সংগ্রহ করলে কে জানে! তার পিতলের বোতামগুলো কাঁধের কাছ থেকে বুক বেড়ে তির্যকভাবে কোমর পর্যন্ত প্রসারিত এবং এই অন্ধকারেও ঝকঝক করছে। কোমরে একটা চওড়া লাল পেটি, তার মাঝখানে একটা তকমা। কি যেন লেখা রয়েছে তাতে, অন্ধকারে পড়া গেল না।

এ ছাড়া ইব্রাহিমের একটা নতুন সহকারীও জুটেছে। উৎসবে অনেকগুলি মাননীয় অতিথির পরিচর্যা একা ইব্রাহিম পেরে উঠবে না বলেই হয়তো এই ছোকরাটিকে বাহাল করা হয়েছে।

আর উড়ে মালীটা তো আছেই।

আগে তার পরণের কাপড় জুটতো তো গায়ে গেঞ্জী জুটতো না, গেঞ্জি জুটতো তো কাপড় জুটতো না। মহেন্দ্র দেখে খুশি হল, তারও ইব্রাহিমের মতো একটা নতুন উর্দি।

দোতলায় উঠতেই নরেন পেনিলোপীকে দেখে থতমত খেয়ে গেল। মেমসাহেব সত্যি। কিন্তু বাঙালী মেয়ের মতো টকটকে লালপাড় একখানি শাড়ী পরা। গায়ে হাতাওয়ালা ব্লাউজ, পায়ে চটি।

মহেন্দ্র পায়ে হাত দিয়ে দাদাকে প্রণাম ক'রে পেনিলোপীর দিকে চেয়ে বললে, আমার দাদা।

নরেনের থতমত ভাবটা ততক্ষণে খানিকটা কেটে এসেছে। সে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিতে যাবে, এমন সময়

পেনিলোপী হেঁট হয়ে তাকে প্রণাম জানিয়ে পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞাসা করলে, কেমন আছেন ?

উত্তর দিতে গিয়ে বিস্ময়ে নরেনের কথা জড়িয়ে গেল। কোনোরকমে বললে, ব,ভালো। আসুন, আসুন। আপনি তো চমৎকার বাংলা বলতে পারেন দেখছি।

পেনিলোপী সলজ্জ হাস্যে উত্তর দিলে, একটু একটু। সবে শিখেছি। এইতো আমার মাষ্টার মশাই।

নরেন খুশি হ'ল না। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ঘরের ভিতরের উজ্জল আলোয় আর একবার ভালো ক'রে তার মুখের দিকে চাইলে।

হঁ্যা, মেম সাহেবই বটে। দুধের মতো শাদা রং, কটা চক্ষু, সোনালি চুল। খাশ বিলিতি মেমসাহেব। কিন্তু শাড়ী পরে কেন ? বাংলাই বা বলে কেন ? সর্বোপরি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ? নরেনের মন খুশি হ'ল না। সাহেব-মেম, ওরা হ'ল রাজার জাত। বেশ জবরদস্ত না হ'লে মন ভরে ? মহেন্দ্রের সঙ্গে একজন মেম সাহেব আসছেন শুনে নরেন খুব খুশি হয়েছিল। কিন্তু পেনিলোপীকে দেখে হতাশ হয়ে গেল !

সকালে পর পর দুখানা মোটরে এলেন সদর থেকে রাজকর্ম্মচারীগণ। ম্যাজিষ্ট্রেটের মোটরে ম্যাজিষ্ট্রেট, তাঁর স্ত্রী আর জজ সাহেব। পিছনে জজ সাহেবের মোটরে এলেন এস ডি-ও, সরকারী উকিল এবং অন্যান্যেরা।

নরেনের নির্বন্ধাতিশয্যে মহেন্দ্র একটা চমৎকার পামবীচের স্যুট পরেছে। বাটন হোলে গুঁজেছে একটা গোলাপ ফুল। নরেনের পাশে দাঁড়িয়ে সে সকলকে সমাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে একটি করে গোলাপ ফুল ওদের বাটনহোলে পরিয়ে দিলে।

উপরে নিয়ে এসে ওদের সঙ্গে পেনিলোপীর পরিচয় করিয়ে দিলে: আমার বন্ধু মিসেস লাহিড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে গ্রামোফোন রেকর্ড বেজে উঠলো: God save the king, আর সবাই সার বেঁধে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। এই ব্যবস্থাটা নরেন গোপনে কখন করেছিল। বুদ্ধিটা সরকারী উকিলের। মহেন্দ্র বাধা দিতে পারে ভেবে ইচ্ছা করেই তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি। গ্রামোফোনটা বাজতে মহেন্দ্র বিস্মিত এবং বিরক্ত হয়েছিল। কিন্তু আরম্ভ যখন হয়েছে, তখন নিঃশব্দে সেটা সহ্য করে যাওয়ার মতো শালীনতা তার আছে।

তার পরেই ছোট হাজরীর পালা।

ব্যবস্থা নরেন দু'প্রস্থ করেছিল। যাঁরা দেশী মতে খাবেন তাঁদের জন্যে ব্যাঙ্কের উপরতলায়, আর বিলিতি মতের জন্যে বাগানবাড়ীতে।

সুতরাং সস্ত্রীক ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ এবং সরকারী উকিল খান বাহাদুর সাদেক আলি ছাড়া আর সকলকে নিয়ে নরেন ছোট হাজরীর আগেই ব্যাঙ্কের বাড়ীতে গেল।

পেনিলোপীকে পেয়ে ম্যাজিষ্ট্রট-পত্নীর খুশি আর ধরে না। তাঁর মনে মনে আশঙ্কা ছিল, মজলিসে তিনিই একমাত্র মহিলা থাকবেন। পেনিলোপীকে পেয়ে তিনি বেঁচে গেলেন। দুজনে পাশাপাশি বসে গল্প জুড়ে দিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জনসন খাবার টেবিলে বসে অনুযোগ করলেন, তুমি তো খুব আমার কাছে গেলে মেজর মুখার্জি। আমরা প্রত্যহ তোমার প্রতীক্ষা করতাম।

মহেন্দ্র বললে, আমি খুব দুঃখিত মিঃ জনসন। আমার যাওয়ার খুবই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তার পরে আমি বেশি দিন ছিলাম না। কলকাতায় চলে যাই।

—তাই নাকি? এবারে ক'দিন আছ?

—দাদা না ছাড়লে বড় জোর পরশু দিনটা।

—তাই তো।

সরকারী উকীল খান বাহাদুর সাদেক আলি সগর্বে বললেন, আমি আপনাকে বলিনি স্যর, মেজর মুখার্জি এবং তাঁর আই-এন-এ'র জন্যে আপনি চিন্তা করবেন না। এ অত্যন্ত রাজভক্ত পরিবার। আপনি স্বচ্ছন্দে নরেনবাবুর নাম রায় বাহাদুরের জন্যে সুপারিশ করতে পারেন। বলিনি?

'গড সেভ দি কিং'এ ম্যাজিষ্ট্রেট খুশি হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, ঠিকই বলেছিলেন।

মহেন্দ্র চট ক'রে বললে, আপনি ঠিকই বলেন নি খাঁ বাহাদুর। আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং হিন্দুস্থানের উপর আমার আনুগত্য ঠিক আগের মতোই আছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট এবং খান বাহাদুর উভয়েই চমকে উঠলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট বললেন, কিন্তু এসে পর্যন্ত তুমি তো কোন আন্দোলনে যোগ দাও নি?

—না। কিন্তু তার কারণ এ নয় যে, আন্দোলনে আমার অনুরাগের অভাব আছে। তার কারণ আমি অন্য ব্যাপারে একটু ব্যস্ত। সময় হলেই আমাকে আন্দোলনে দেখতে পাবে।

মিঃ জনসন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে খান বাহাদুরের দিকে চাইলেন।

মহেন্দ্র হাসলে। বললে, কিন্তু তার জন্যে অনুতাপের কোন কারণ নেই মিঃ জনসন। উপাধি তো তোমরা আমাকে দিওনি। দিলেও নিতাম না। কিন্তু যাঁকে দিয়েছ, তাঁর রাজভক্তি সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহের কারণ নেই। উপাধির অপব্যবহার যে সেখানে হবে না, এ আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিতে পারি।

ম্যাজিষ্ট্রেট ঠিক খুশি হলেন ব'লে মনে হ'ল না। কিন্তু তখনকার

মতো চেপে গেলেন। বিশেষ, খেতাব দিয়ে তো আর কেড়ে নেওয়া যায় না।

মহেন্দ্র হেসে আবার বললে, কথাটা শুনে তুমি খুশি হতে পারো নি মিঃ জনসন। হয়তো আমার উপর শ্রদ্ধাও কমে গেল। কিন্তু তোমারই একটি ভাই স্বদেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছে, তার জন্যে তুমি কি করে থাক? শুধু ভারতের লোক দেশের জন্যে প্রাণ দিতে গেলেই কি অশ্রদ্ধেয় হয়ে যায়?

ম্যাজিস্ট্রেট লাফিয়ে উঠে ওর হাত দুটো জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, সে কথা তো আমি একবারও বলিনি মেজর মুখার্জি। আমি স্বাধীন দেশের লোক, দেশভক্তি বুঝি। কিন্তু এটাও মনে রেখো, একটা পরাধীন দেশকে শাসনে রাখবার জন্যেই রাজশক্তি আমাকে নিযুক্ত করেছেন।

বলেই জোরে জোরে প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন। স্বয়ং খান বাহাদুরও সে হাসিতে যোগ দিলেন।

ওঁরা লাঞ্চে বসবেন এমন সময় ভিতরে গ্রামোফোন আরম্ভ হ'ল:

বন্দে মাতরম্!
সুজলাং সুফলাং
মলয়জ শীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।

সস্ত্রীক মিঃ জনসন, পেনিলোপী এবং মহেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। শুধু খান বাহাদুর সেকেণ্ড কয়েক হতভম্বের মতো ব'সে থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

গান থামতে সবাই বসলেন, খান বাহাদুরও ফিরে এসে আগের আসন গ্রহণ করলেন। তাঁর মুখে বিরক্তির ছাপ।

মহেন্দ্র হেসে জিজ্ঞাসা করলে, এই গান আপনারা পছন্দ করেন না, না খান বাহাদুর? আগে করতেন, এখন করেন না।

খান বাহাদুর গম্ভীর মুখে বললেন, মেজর মুখার্জি, আমরা পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিই না।

—খৃষ্টানরাও তো দেয় না। অথচ মিঃ এবং মিসেস জনসন তো উঠে দাঁড়ালেন। বাইরে পালিয়ে তো গেলেন না।

—সে কৈফিয়ৎ তো আমার দেবার নয় মেজর মুখার্জি। তা ছাড়া হিন্দু-মুসলমানের রাজনীতিও তো এক নয়। আমরা পৃথক নেশ্যন। 'বন্দেমাতরম' আমাদের ভালো লাগবার তো কোন কারণ নেই।

—কিন্তু নেশ্যন তো একটা ভৌগলিক স্বত্বা খান বাহাদুর। ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সে ইউরোপের সব দেশের লোকই গিয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল সেখানে বাস ক'রে আজকে তাদের সবাই আমেরিকান। তারা আমেরিকান স্বার্থের জন্যে যুদ্ধ করে, প্রাণ দেয়।

—তারা ধর্মে এক।

—তাই বা এক কই? রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেষ্টান্টের বিরোধ ইতিহাসেই পড়েছেন। কিন্তু তাদের কথাও ছেড়ে দিলাম। ইহুদীদের তো আপনি খৃষ্টানদের সঙ্গে ধর্মে এক বলতে পারেন না। তারাও তো আমেরিকান নেশ্যনের অন্তর্ভুক্ত।

—ইসলাম ভৌগলিক ব্যবধান স্বীকার করে না।

—করে না? তুর্ক, আরব, আফগান কি এক নেশ্যন? এরা তো মুসলমান।

মিসেস জনসন এবং পেনিলোপী সকৌতুকে ওদের তর্ক উপভোগ করছিলেন। তাঁদের দিকে চেয়ে খান বাহাদুর আর জবাব দিলেন না, বড় একটা টুকরো মাংস কেটে নিয়ে মুখে দিলেন।

মহেন্দ্র থামলে না। বলতে লাগলো:

আশ্চর্য! আপনি এবং আমি অথবা আমার প্রতিবেশী ওই ইব্রাহিম আমি এক নেশ্যন নই, একথা আমি ভাবতেই পারিনে। এদেশের হিন্দুরাই মুসলমান হয়েছে। তাছাড়া তাদের স্বার্থও এক। দুর্ভিক্ষ এবং ম্যালেরিয়ায় এক সঙ্গেই তারা মরে, মাঠে ফসল ভালো হ'লে তারা এক সঙ্গেই আনন্দ করে। তবু আমাদের পৃথক নেশ্যন হতেই হবে, কারণ ইংরেজ মনিবকে সন্তুষ্ট ক'রে তাদের কাছ থেকে দু'টুকরো হাড় পাবার সেইটেই সুলভ উপায়।

খান বাহাদুর বললেন, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতায় মুসলমানদের উপর প্রভুত্ব করবার জন্যেই কি আপনারা এক নেশ্যন এবং অখণ্ড ভারতের ধুয়ো তোলেনি? সত্যি ক'রে বলুন।

—সত্যি ক'রেই বলছি, না। নেতাজির অধীনে হিন্দু-মুসলমান-শিখ সবাই মিলে আমরা যখন ভারতের স্বাধীনতার জন্য রক্তক্ষয় করছিলাম, এ প্রশ্ন তখন আমাদের মনেও ওঠেনি যে, নেতাজি হিন্দু কি মুসলমান, কিংবা কার ভাগে কি পড়বে। ভারত যখন স্বাধীন হবে, তখনও সে প্রশ্ন উঠবে না এও আপনি নিশ্চয় জানবেন। শ্যামদেশের যমজের মতো সুখে দুঃখে আমরা এমন এক হয়ে আছি যে, একজনকে মেরে আর একজনকে বাঁচানো যাবে না। আমাদের আজ নিঃসংশয়ে বুঝতে হবে, বাঁচলে আমরা সবাই বাঁচবো, নয়তো কেউ বাঁচব না।

মিসেস জনসন খুশিতে হাততালি দিয়ে বললেন, হিয়ার, হিয়ার।

সবাই হেসে উঠলো। একটা গুরুতর বিষয়ে তর্কের ফলে ঘরের হাওয়া যেটুকু ভারি হয়ে উঠেছিল, এই একটা কথায় তা লঘু এবং স্বাভাবিক হয়ে এল।

আবার সবাই গল্পে মন দিলে।

মিসেস জনসন তাঁর রিষ্টওয়াচের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের কখন বেরুতে হবে চার্লি?

মিঃ জনসন খান বাহাদুরের দিকে চেয়ে বললেন, পাঁচটায় বেরুলেই হবে বোধ হয়?

খান বাহাদুরের মনের বিরক্তি তখনও কাটেনি। তবু যথাসাধ্য শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন, তা হবে।

—অনেক ধন্যবাদ। যথেষ্ট আনন্দ পেলাম।—ব'লে মিসেস জনসন স্মিত দৃষ্টিতে মহেন্দ্রের দিকে চাইলেন।

কুণ্ঠিতভাবে মহেন্দ্র বললে, এ কিছুই নয়, মিসেস জনসন। আর ধন্যবাদ যদি কারও প্রাপ্য হয়, সে দাদার, আমার নয়। বলতে গেলে আমিও আপনাদেরই মতো অতিথি।

সবাই হাসতে লাগলেন।

উনিশ

চা পানের পর পাঁচটার সময় অভ্যাগতেরা বিদায় নিলেন। বিদায়কালে গৃহস্বামী ও অতিথিদের মধ্যে যে সমস্ত ভালো ভালো বিনয়-বাক্য ব্যবহৃত হয়, তার একটাও বাদ গেল না। শুধু ওরই মধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল, যা কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করলো না।

সে হচ্ছে এই যে, ওরই মধ্যে এক সময় মিসেস জনসন তাঁর স্বামীকে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পেনিলোপীর শাড়ীখানার দিকে অপাঙ্গে চেয়ে বললেন, অমনি একখানা শাড়ী আমার চাই।

—পরবে?

—হাঁ। শাড়ীতে মেয়েদের কি সুন্দর মানায়!

মিঃ জনসন হেসে বলেছিলেন, আচ্ছা।

তারপরে সবাই চলে গেলে বাগানবাড়ীর দোতলার বারন্দায় পেনিলোপী আর মহেন্দ্র ত্বখানা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো।

তখনও সূর্য অস্ত যায় নি। কিন্তু রোদের একেবারেই তেজ নাই। কমলা লেবু রঙের সেই সোনালি রোদ ওদের মুখে এসে পড়েছে।

পেনিলোপী বললে, মহেন্দ্র, এইবার ?

—কি এইবার ?

—তোমার সেই মেয়েটিকে যে দেখাবে বলেছিলে।

—তাকে দেখবার কিছু নেই পেনিলোপী। দেখে সুনিশ্চিত তুমি হতাশ হবে।

—বাজে কথা ব'লে আমাকে ভোলাতে পারবে না।

—বেশ দেখো। কিন্তু তার আগে তার সমস্ত কথা তোমার জানা দরকার।

বলে একে একে মহেন্দ্র সমস্ত কথা বলতে লাগলো: সেই করবী গাছের অন্তরালে হৃদয় বিনিময় থেকে আরম্ভ ক'রে বিবাহের ব্যর্থ চেষ্টা, বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ ও বৈধব্য এবং মহেন্দ্র যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পরে যা যা ঘটেছে সমস্ত বিবৃত ক'রে শেষে বললে, এখন সে কোথায় আছে জানো ? আমাদেরই বাড়ীতে রাঁধে।

পেনিলোপী চমকে উঠলো:

—বলো কি ? রাঁধে কেন ?

—পেট তো চালাতে হবে। ভায়েরা খেতে দিতে নারাজ। যার সঙ্গে তার নামমাত্র বিয়ে হয়েছিল তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি প্রাণ গেলেও সে ছোঁবে না।

পেনিলোপী শুধু বললে, আশ্চর্য মেয়ে !

তারপর বললে, তোমাদের বাড়ী গেলেই তো তাহলে তাকে দেখা যাবে।

জা হবে।

—মহিন, ওঠো। আমি এখনই তোমাদের বাড়ী যাব। এখনও সন্ধ্যা হয়নি। তোমার অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। কিছুই করতে হবে না তোমাকে। শুধু তোমার বৌদির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েই চলে আসবে।

মহেন্দ্র হাসলে। বললে, তারপরে অত বড় বাড়ীতে তাকে খুঁজে বার করবে কি করে?

—তা জানি না। কিন্তু এটুকু জানি যে, তাজমহলের মতো বাড়ীও তাকে ঢেকে রাখতে পারে না।

—কিন্তু তার নামটাও যে জানোনা তুমি?

পেনিলোপী অসহিষ্ণুভাবে মহেন্দ্রকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, কেন মিথ্যে সময় নষ্ট করছ মহিন, সে মেয়ের নাম জানার দরকার করে না। নাম তার লেখা আছে চোখের আগুনে, লেখা আছে উজ্জ্বল ললাটে। সে লেখা পড়বার মত বিদ্যে আমার না থাকলে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে তোমাদের দেশে এসে পৌঁছুতে পারতাম না। এখন একটু দয়া করে ওঠো দিকি।

বলে একপ্রকার ঠেলতে ঠেলতেই পেনিলোপী মহেন্দ্রকে নিয়ে চ'লে গেল।

পথে চলতে চলতেই মহেন্দ্র পেনিলোপীকে তাদের বাড়ীর গোঁড়ামির কথাটা শুনিয়ে দিলে। বিধবা মায়ের জন্যে দোতলা অবধি যে জুতা চলে না, তাও জানিয়ে দিলে। এবং আরও টুকিটাকি কয়েকটা পরামর্শ দেওয়ার পর বৌদির কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে।

—ভাঁড়ার থেকে একবার বেরিয়ে এসো বৌদি, সঙ্গে একজন নতুন মানুষ এনেছি।

উপর থেকে সাড়া এল : আমি দোতালায় ঠাকুরপো। একটু কষ্ট ক'রে উপরে এস।

নিচে জুতো খুলে উপরে যেতে যেতে মহেন্দ্র বললে, তোমারও প্রমোশন হয়েছে দেখছি বৌদি। নিচে না থেকে উপরে থাকো।

—চিরকালই নিচে ফেলে রাখবে? তা কি হয়?

ব'লে হাসতে হাসতে পেনিলোপীকে নমস্কার ক'রে বললে, আসুন, আসুন।

একজন দাসী বারান্দায় একখানা কম্বল বিছিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। পেনিলোপী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে একেবারে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। মেয়েটি নিঃশব্দে চ'লে যাচ্ছিল, পথ অবরুদ্ধ দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

পরণে তার একখানি মলিন ধুতি। জায়গায়-জায়গায় ছেঁড়া। তাই দিয়ে কোনো প্রকারে দেহ ঢেকে লজ্জা নিবারণ করেছে।

পেনিলোপী তাকে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি এখানে কি কর ভাই? রাঁধো?

মেয়েটি থতমত খেয়ে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে।

পেনিলোপী বাঁ হাত বাড়িয়ে তাকে বুকের কাছে টেনে এনে বললে, তা পালাচ্ছিলে কেন ভাই? ছোঁয়া যাবে?

লজ্জিতভাবে গায়ত্রী বললে, না-না। ছোঁয়া যাবার কিছু নেই। আমার গা-ধোয়া এখনও হয়নি।

—তবে আমাদের সঙ্গে বসে একটু গল্প করবে না ভাই? আমি কত দূর দেশের মেয়ে। তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করবার জন্যেই আমি মহিনের সঙ্গে এসেছি। পরিচয় না ক'রেই কলকাতায় ফিরে যাব?

এমন আকুতির সঙ্গে পেনিলোপী কথা ক'টি বললে যে, স্বুবর্ণ পর্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বললে, বোস না গায়ত্রী। একটু পরেই না হয় গা ধুতে যাবি? ওমা, ঠাকুরপো চলে গেল কখন?

সেকথা শুধু গায়ত্রী জানে। ঘর থেকে কম্বলটা নিয়ে সে বার হতেই মহেন্দ্র স'রে পড়ে। কিন্তু কিছুই সে বললে না।

পেনিলোপী স্থবর্ণর দিকে চেয়ে বললে, কাল দুপুরে তোমার বাড়ীতে যে আমার নিমন্ত্রণ দিদি। আমি তোমাদের রান্না কখনও খাইনি। আসনে ব'সে কলাপাতায় খেতে ভারী লোভ হচ্ছে।

স্থবর্ণ বললে, বেশ তো। তোমার আর ঠাকুরপোর দু'জনেরই কাল দুপুরে এখানে নিমন্ত্রণ রইলো। ঠাকুরপো তো চ'লে গেছে, তাকেও জানিয়ে দিও।

—দোব। কিন্তু কি কি রাঁধবে ভাই গায়ত্রী? দু'একটি নাম আগে থেকে শুনিয়ে দাও, সারারাত্রি জপ করব।

স্থবর্ণ এবং গায়ত্রী উভয়েই হেসে ফেললে।

গায়ত্রী বললে, কি খেতে চান বলুন। তাই রাঁধব।

পেনিলোপী বললে, তোমাদের রান্নার কিছুই তো আমি জানিনে ভাই। যা ইচ্ছা হবে, তাই রেঁধে খাইও। আমি খুশি হয়ে ফিরব। কিন্তু তুমি আমাকে আপনি বলছ কেন ভাই? ওতে আমি লজ্জা পাই। আমি তো তোমাকে বন্ধু বলেছি।

—সে আপনার উদারতা। কিন্তু আমি যে কত সামান্য মেয়ে সে তো আমি জানি।

—তুমি সামান্য মেয়ে! তাহ'লে ওই ছেঁড়া ময়লা কাপড়েও প্রথম দেখাতেই তোমাকে চিনলাম কি করে? অত ভুল দেখবার চোখ তো আমার নয়।

বিব্রতভাবে গায়ত্রী বললে, কিন্তু আপনি তো আমার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না মেমসাহেব। আমি এঁদের দাসী।

—তা হবে। কিন্তু সেইটেই কি তোমার সব পরিচয়?

—বলতে পারি না। কিন্তু আর যদি কিছু পরিচয় থাকেও তাও তো আপনি জানেন না।

—জানবার দরকার তো করে না ভাই। তুমি কি শোননি মানুষের সত্যিকার পরিচয় লেখা থাকে তার মুখে ?

—সকলের হয়তো থাকে না মেমসাহেব। কিন্তু আজকে আমি উঠি। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আমার অনেক কাজ বাকি।

ব'লে সবিনয়ে নমস্কার জানিয়ে গায়ত্রী উঠে গেল।

সুবর্ণ বললে, তুমি ঠিকই ধরেছ ভাই। মেয়েটি বড় ভালো। পরের বাড়ী খেটে খাবার কোনো দরকারই ওর ছিল না। তবু কেন যে তাই করছে, ওই জানে।

পেনিলোপী বললে, খেটে খাওয়া তো দোষের কিছু নয় দিদি।

সুবর্ণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, তোমাদের দেশে হয়তো নয় ভাই, কিন্তু এদেশে দোষের যদি বা নাও হয়, ভয়ানক দুর্ভাগ্যের। সে দুর্ভাগ্যের সীমা নেই।

একটু থেমে বললে, মেয়েটি এত ভাল যে বলবার নয়। কী আত্মসম্মান-জ্ঞান অথচ কী নম্র! ছেঁড়া কাপড়খানা দেখে-একখানা নতুন কাপড় এনে দিয়েছিলাম। হেসে ফিরিয়ে দিয়ে বললে, কাপড় তো আমার এখনও পাওনা হয়নি বৌদি! এখন রেখে দিন, দরকার হ'লেই চেয়ে নোব।

তারপর আবার বললে, অন্যদের সঙ্গে ওর একটু ইতর-বিশেষ করলে ও যেন লজ্জায় ম'রে যায়। বলে, অত প্রশ্রয় দেবেন না বৌদি, তাহ'লে আমার একূলও যাবে ওকূলও যাবে। তবু পারি না ভাই। থালা সাজিয়ে ও যে আমার সামনে থালা ধ'রে দেবে, এ আমি কিছুতেই পারি না। ওকে টেনে নিয়ে সকলের শেষে একসঙ্গে দুজনে বসে খাই।

সুবর্ণ আঁচলে চোখ মুছলে।

পেনিলোপী বললে, কালকে আমিও একপাশে বসব দিদি। সঙ্গে নিয়ে তো খাবেন না জানি। দূরে ব'সেই খাব। তবু একসঙ্গে খাব তো।

ব'লে হাসলে।

একটু পরে বললে, অন্ধকার হয়ে আসছে, এইবার উঠি। আবার কাল দুপুরে দেখা হবে।

স্বর্ণ উঠে বললে, হ্যাঁ। দাঁড়াও ভাই, তোমার সঙ্গে একজন লোক দিই।

—লোক?—পেনিলোপী হেসে বললে,—লোক কি হবে? আমি কি তোমাদের মতো যে, একলা যেতে ভয় করবে?

স্বর্ণও হেসে ফেললে। বললে, তা বটে। ভয় তোমাদের কাছে ঘেঁষে না।

পেনিলোপীকে পৌঁছে দিয়ে মহেন্দ্র ফিরে এসে দেখে, নিচে বারান্দায় গোলক উবু হ'য়ে বসে আছে। মহেন্দ্রকে দেখে সেইখান থেকেই সে গড় হয়ে প্রণাম করলে।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, ভালো আছ গোলকদাদা? এস, এস, উপরে এস।

উপরে এসে মহেন্দ্র একটা চেয়ারে বসলে। অদূরে মেঝের উপরে বসলো গোলক। জিজ্ঞাসা করলে, ওবাড়ী থেকে আসছেন ছোটবাবু?

—হ্যাঁ।

—দেখে এলেন আমার দিদিমণিকে?—বলে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলো।

জবাব দিতে গিয়ে মহেন্দ্রের গলার স্বর যেন বন্ধ হয়ে এল। কোনোক্রমে ঘাড় নেড়ে জানালে, হ্যাঁ।

গোলক বললে, আপনি তো অনেক বই পড়েছ ছোটবাবু। কোন্ পাপে আমার সতী-সাবিত্রী দিদিমণি এত কষ্ট পাচ্ছে বলতে পারেন?

—বলতে পরি না গোলকদাদা।

—তাহ'লে ধম্ম-কম্ম, শাস্তর-টাস্তর সব মিথ্যে ?

—কি জানি ভাই। তবু সীতার কথা একবার ভাব। স্বামী স্বয়ং ভগবান, নিজে লক্ষ্মীর অংশ। তিনি কেন কষ্ট পেলেন? গোলকদার্দা, যাকে আমরা কষ্ট ভাবি, সত্যিসত্যি হয়তো তা কষ্ট নয়। আগুনে পুড়লে সোনার তো কষ্ট হয় না, বরং জৌলুস বাড়ে।

সোৎসাহে গোলক বললে, ঠিক বলেছেন, ছোটবাবু। ওরা সতী-সাবিত্রী, মা-লক্ষ্মীর অংশ। ওদের কষ্ট হয় না। কিন্তু আমি তো পারি না ছোটবাবু, আমার বিহিত করুন।

—কী হয়েছে তোমার ?

বলেছিলাম, বৌছেলে সব তো ম'রে ভূত হয়ে গেল। থাকবার মধ্যে আছে একটি বুন। তা এই মরা-হাড়েও একটা বুনকে খেতে দিতে খুব পারব। তুমি খাটতে কোথাও যেও না দিদিমণি, তুমি খাটতে যেও না। তা শুনলে না তো আমার কথা।

—কী আর করবে বলো ?

—না, করার কিছু নাই। কাল একবার উঁকি মেরে দেখলাম ছোটবাবু, শতছিন্ন ময়লা কাপড়ে সোনার অঙ্গ ঢেকে দিদি আমার ঝি-চাকরকে ভাত দিচ্ছে। বুকের ভেতরটা কেমন ক'রে উঠলো ছোটবাবু। মনে হ'ল মাথা ঘুরে পড়ব বুঝি। বাড়ী এসে ভাবলাম, আর কেন? ষোলো আনা সুখ তো মিটলো। একবার গাঁ ছেড়ে যেদিকে দুই চোখ যায় পলাই। কিন্তু পালাতেও তো পারি না। পা দুটোকে কে যেন মাটির ভেতর টানে। আমি কি করি বলো তো ছোটবাবু ?

পরামর্শ দেবার কিছুই ছিল না। মহেন্দ্র ঘাড় হেঁট ক'রে চুপ ক'রে রইল।

গোলক বললে, আপনার কথা সে শোনে ছোটবাবু। আপনি তাকে বুঝিয়ে কিছু বলতে পারো না ?

মহেন্দ্র বললে, আমার কথা সে শুনবে না গোলক দাদা। শুনবে বুঝলে নিশ্চয়ই বলতাম।

—একবার ব'লে দেখবেন?

—না।

গোলক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

ঠিক সেই সময় সিঁড়িতে চটি জুতার শব্দ পাওয়া গেল, এবং পরক্ষণেই পেনিলোপী এসে বললে, সু-খবর মহিন!

তার পরে গোলকের দিকে দৃষ্টি পড়তেই জিজ্ঞাসা করলে, এ কে?

মহেন্দ্র বললে, ও একটি হতভাগা। সংসারে যে ক'জন তাকে ভালোবেসে কষ্ট পাচ্ছে, ও তাদেরই একজন। নাম গোলক।

—I see.

মেমসাহেব দেখে গোলক ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো।

বললে, আজ তাহ'লে উঠি ছোটবাবু। একটু কাজ আছে। কাল সকালে বরং আসব।

ব'লে মেম সাহেবের দিকে দৃকপাত মাত্র না ক'রে চলে গেল।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, সুখবরটা কি?

—কাল দুপুরে তোমার এবং আমার দুজনেরই ওবাড়ীতে নিমন্ত্রণ। অতি অবশ্য যেতে হ'বে।

—সর্বনাশ! এমন তো হবার কথা নয়!

—কেন?

—আমরা ওবাড়ীতে খেলে দাদা মেঝের সিমেণ্ট থেকে দেওয়ালের প্ল্যাষ্টার পর্যন্ত তুলে ফেলবেন

—বলো কি!' এত

—হ্যাঁ। আমি ফিরে পর্যন্ত ওবাড়ীতে একদিনও নিমন্ত্রণ হয়নি।

আমার জায়গা হয়েছে এই বাগান-বাড়ীতে। ওঁরা নিজেই নিমন্ত্রণ করলেন, না তুমি যেচে নিলে?

—যেচেই নিলাম।

—তাই বলো। তবু তুমি ভাগ্যবতী। তাকে দেখলে?

—দেখলাম বই কি? কত গল্প হ'ল।

—দেখে চিনতে পেরেছিলে?

—তৎক্ষণাৎ। জিগ্যেস কোরো বৌদিকে।

ইব্রাহিম দরজার গোড়া থেকে সেলাম ক'রে জানালে, ডিনার তৈরি। টেবিল সাজাবো কি?

সেদিকে কর্ণপাত না ক'রে মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, গায়ত্রীকে কেমন দেখলে বলো তো?

—সে উত্তর আর একদিন দোব। ডিনার তৈরি। চল এখন।

ব'লে পেনিলোপী মহেন্দ্রকে খাবার টেবিলে নিয়ে এল।

খেতে ব'সে হঠাৎ মহেন্দ্র বললে, তুমি একটা কাজ করতে পারো পেনিলোপী? তাহ'লে চিরজীবন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব।

পেনিলোপী হেসে বললে, সে একটা মস্ত প্রলোভন। বলো কি করতে হবে।

—এই রান্নার কাজটা ছেড়ে দিতে তুমি কোনো রকমে তাকে রাজি করাতে পারো? নবদ্বীপ, কাশী, বৃন্দাবন, যেখানে খুশি সে যাক, আমি মাসে-মাসে তাকে খরচ দোব। আমার নিজের জন্যে একথা বলছি না পেনিলোপী। কিন্তু ও যদি আরও কিছুদিন এমন কষ্ট করে, তাহ'লে ওই যে গোলক লোকটিকে দেখলে ও ম'রে যাবে।

পেনিলোপী এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে বললে, আমাকে মাফ কোরো মহিন, ও অনুরোধ গায়ত্রীকে আমি কিছুতেই করতে পারব না।

—পারবে না কেন?

—অন্যায় ব'লেই পারব না। বর্তমান অবস্থায় ওঁর পক্ষে এর চেয়ে সম্মানজনক জীবন আমি ভাবতেই পারি না।

মহেন্দ্র আর অনুরোধ করলে না। শুধু জড়িতকণ্ঠে গজ-গজ করে বললে, আমার নিজের জন্য বলি নি, ওই গোলকটার জন্যেই কষ্ট হয়। লোকটা যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে।

পেনিলোপী উত্তর দিলে না। কিন্তু মহেন্দ্র ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে টের পেতো, মহেন্দ্রের কথায় ওর ঈষৎ-উন্মিন্ন ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখা খেলে গেল।

কুড়ি

রাত্রে নরেন স্বর্ণকে জিজ্ঞাসা করলে মেমসায়েব দেখলে?

ডিবে থেকে একটি পান নরেনকে দিয়ে স্বর্ণ আর একটি নিজে নিলে। হেসে বললে, দেখলাম। আজ বিকেলে এসেছিলেন যে!

—তার পরে?

—মেমসায়েবকে শাড়ী পরলে কি সুন্দর লাগে দেখেছ? যেন সরস্বতী ঠাকরুণ, না?

—অনেকটা। তারপরে?

—চমৎকার বাংলা বলে। একেবারে বাঙালীই হয়ে গেছে। কি আশ্চর্য দেখ! ভাষা এক নয়, দেশ এক নয়, ধর্ম এক নয়, রংও এক নয়,—সেই স্বামীর ঘর করতে কত দূর থেকে এসেছে। বেশ লাগলো মেয়েটিকে। তবে বয়স হয়েছে বাপু। ঠাকুরপোদেরই বয়িসী, বড় হবে তো ছোট হবে না।

—তা হবে না? ওদের তো তোমাদের মতো বারো-চোদ্দ বছরে বিয়ে হয় না। কিন্তু একটা বিষয় আমার ভারি বিশ্রী লাগে।

—কি?

—কোথায় রইলো স্বামী, মেয়েটা একটা পরপুরুষের সঙ্গে নির্জন একটা বাড়ীতে দিন-রাত্রি কাটাচ্ছে। দেখতে ভালো লাগে না।

একটা পরিহাসের লোভ সুবর্ণ সামলাতে পারলে না।

বললে, সবাই তো তোমাদের মতো নয়। কেউ কেউ স্ত্রীকে বিশ্বাস করতেও জানে।

কথাটার মধ্যে খোঁচা ছিল। কিন্তু তা গায়ে না মেখেই নরেন বললে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয় বড় বৌ। কিন্তু পাঁচজনের চোখে দেখতে খারাপ লাগে। তাছাড়া ভয় যে নেই তাতো নয়।

সুবর্ণ বললে, ভয় যদি কারো থাকেই তা'হলে যে পুরুষের দুর্মতি হবে তারই, ওর নয়। দেখেছ হাতের কব্জি, পায়ের গোছ?

নরেন হেসে ফেললে। বললে, তা বটে!

সুবর্ণ বললে, বাঙালী মেয়ে ওর মতো চললে-ফিরলে বেহায়া মনে হয়। কিন্তু ওকে তা মনেই হয় না। ছেলেবেলা থেকে অমনিভাবেই ওরা মানুষ। দেখলেই মনে হয়, ওই ব্যবহারটাই ওদের স্বাভাবিক। ও যদি একগলা ঘোমটা দিয়ে এ বাড়ী ঢুকতো, তাহ'লেই বেমানান লাগতো, হাসি আসতো।

—যা বলেছ!

—বাচাল তো নয়। মুখে একটা গাম্ভীর্য আছে। আর কথাগুলো কি মিষ্টি! কাল এখানে খাবে। নিজেই যেচে নিমন্ত্রণ নিলে। না বলতে পারলাম না।

নরেন চমকে উঠলো। বললে, সর্বনাশ! জাতজন্ম আর রাখবে না দেখছি। কাজটা ভালো হয় নি। ওরা সব মাংস-টাংসই খায় বেশী। সে সব এ বাড়ীতে ··

বাধা দিয়ে স্বর্ণ বললে, সেসব এ বাড়ীতে হবে কেন? তা খেতে চায়ও না ও। আমরা যা খাই, তাই খেতে চায়।

—ও বাড়ী থেকে আবার টেবিল-চেয়ার আনতে হবে তো?

—না, না। আমাদের সঙ্গে মেঝেয় ব'সেই খাবে। জ্ঞান কিন্তু টনটনে আছে, জানলে? ব'ললে এক সঙ্গে বসে তো খাবে না দিদি, আমি বরং ঘুরে বসেই খাব।

স্বর্ণ হাসলে।

কিন্তু এ সব ব্যাপারে নরেনের একটা ভয় আছে। বললে, রাগ-টাগ করেনি তো? একে অতিথি, তায় মেম সায়েব। ওদের রাগকে বড় ভয় করি।

—না, না। বললাম না, ভারী ঠাণ্ডা মেয়ে। কিন্তু একটা আমার মনে খুব সন্দেহ হয়।

—কি সন্দেহ?

—ঠাকুরপোর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে তো বোঝাই যায়, নইলে তার সঙ্গে একা এতদূর কখনই আসতো না। আমার বেশ সন্দেহ হচ্ছে, এ বাড়ী এসে পর্যন্ত ওর লক্ষ্যই ছিল গায়ত্রীর উপর। তাকে কাছে টেনে বসানো, তার সঙ্গে গল্প করা,

—তাতে কি হয়েছে?

—স্বর্ণ হেসে বললে, তুমি কিছুই বোঝ না কেন?

—বোঝবার কিছুই পাচ্ছি না যে!

স্বর্ণ বললে, তোমাকে বললাম ওদের দুজনের বিয়ে দিয়ে দাও। হ'লই বা বিধবা! বিধবা বিয়ে তো চলছে আজকাল।

বাধা দিয়ে নরেন বললে, সে আমি পারব না বাপু। প্রাণ থাকতে নয়। ওর ইচ্ছে থাকে, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে করুক। আমি বাধাও দেব না, ওর মধ্যেও থাকবো না।

—মেয়েটার কষ্ট তো আর দেখা যায় না।

—সে তো ও ইচ্ছা করেই করছে বড় বৌ। আমরা কি করব বলো? ওর সম্পত্তি আছে, বিক্রি ক'রে দিব্যি পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে খেতে পারে। তা না করতে চায়, শ্বশুরবাড়ীতে গিয়েও থাকতে পারে। তাই তো সবাই করে।

বিরক্ত হয়ে স্বর্ণ বললে, তা বটে! মেয়েটার সবই বে-আকার!

একটু পরে নরেন বললে, নতুন পুকুরে মাছ ধরাতে হবে কাল। গলদা চিংড়ি অন্তঃস্বর এ সময়ে কত! এবারে ডাকই শোনা যায় না! খয়রা মাছ ভেজো। কিছু মৌরলা মাছ। কই মাছের একপিঠ ঝাল, এক পিঠ টক কোরো। মাছের রান্নাই বেশি কোরো। মেমসায়েবকে কতকগুলো শাক-পাতা খাইও না যেন, তাহ'লে অবেলায় ইব্রাহিমের আবার খাটুনি বাড়বে!

স্বর্ণ হেসে বললে, সে যা-হয় হবে। তোমাকে আর রাত জেগে রান্নার ফর্দ করতে হবে না, ঘুমোও।

ধমক খেয়ে নরেন পাশ ফিরে শুয়ে পড়লো।

মহেন্দ্র কিন্তু বেঁকে দাঁড়ালো।

সকালে উঠেই পেনিলোপীকে জানিয়ে দিলে, ও-বাড়ীতে নিমন্ত্রণে সে যাচ্ছে না। সে এখানেই খাবে।

পেনিলোপী বললে, হতেই পারে না। কত ভাগ্যের নিমন্ত্রণ, এমন ক'রে হাত ছাড়া করা যেতেই পারে না।

—তুমি যাও না। তোমাকে তো আটকাচ্ছি না।

—তুমিই বা যাবে না কেন? তোমারই বা আপত্তি কিসের?

—আছে। সে তুমি বুঝবে না।

পেনিলোপী হেসে বললে, আমি বুঝব না? সেদিনের ছেলে তুমি, হাঁ করলে পেটের ভেতর দেখতে পাই।

—তা'হলে আর কেন? আমি হাঁ করি, তুমি চুপি চুপি পেটের ভেতর দেখে নাও। মুখে কিছু জিগ্যেস কোরো না।

—মেয়েটি হয়তো ছেঁড়া কাপড়ে ররিবেশন করবে, সে তুমি দেখতে পারবে না। এই তো? কী পাগল ছেলে তুমি মহিন?

মহেন্দ্র হেসে বললে, মেয়েরা অল্প বয়সেই ডেঁপো হয়!

পেনিলোপী তাকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, বাজে কথা ছেড়ে দাও। তুমি যাবে কি না বলো।

—না।

এমন সময় গোলক এসে ওদের কলহে বাধা দিলে। মেমসাহেবকে দেখে বাইরে থেকেই অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে গোলক ডাকলে, ছোটবাবু!

—ভিতরে এস গোলক দাদা।

গোলক তথাপি উসখুস করে, ভিতরে আসে না।

মহেন্দ্র হেসে বললে, মেম সায়েব কিছু বলবেন না গোলক দাদা, তুমি তুমি নির্ভয়ে এস।

তখন গোলক ভিতরে এল। গায়ে তার একটা চেক-কাটা সুতী আলোয়ান, তার সহস্র জায়গায় ছিদ্র, তার ফাঁক দিয়ে তার রুক্ষ-কর্কশ চামড়া এবং হাড়-পাঁজরা দেখা যাচ্ছে।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, মেম সায়েবকে তোমার এত ভয় কেন গোলক দাদা?

মহেন্দ্রের কাছে বসে গোলকের ভয় খানিকটা কেটে গিয়েছিল। আড়-চোখে পেনিলোপীর সুন্দর স্মিত মুখের দিকে চেয়ে বাকিটুকুও কেটে গেল।

সে উত্তর দিলে, আর একদিন বলব ছোটবাবু।

পেনিলোপী হেসে বললে; এখন বলতেই বা দোষ কি গোলক? তুমি এখনই বলো।

ঘটনাটা এমন কিছু নয়। বহুকাল পূর্বে গোলক একবার সদরে গিয়েছিল। শহর দেখা সেই তার প্রথম এবং শেষ। বাজারে সে ঘুরছিল, এমন সময় একটা জমকালো ফিটন গাড়ী এসে দাঁড়ালো। যাবার রাস্তা নেই। একখানা মহিষের গাড়ী আড়াআড়ি রাস্তাটা আটক ক'রে আছে। ফিটনের কোচোয়ান যতই ঘণ্টা বাজায়, মোষের গাড়ী নড়েও না, চড়েও না। ভিতরে যে মেমসাহেব ব'সে আছে, মোষের গাড়ীর গাড়োয়ান তা বোধ হয় দেখতে পায় নি। হঠাৎ লালমুখ ক'রে ফিটন থেকে লাফিয়ে নেমে এল মেমসাহেব, এবং কোচোয়ানের হাত থেকে চাবুকটা টেনে নিয়ে গাড়োয়ানকে কী মার যে মারলে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। মনে করলে এখনও গোলকের বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ ক'রে ওঠে। মেয়েমানুষের হাতে মার খাওয়ার চেয়ে বেটাছেলের লজ্জার আর কী আছে!

সেই থেকে গোলকের মেমসাহেবকে বড় ভয়।

গল্পটা শুনে মহেন্দ্র আর পেনিলোপী হেসে আকুল।

পেনিলোপী হেসে বললে, তোমার ভয় নেই গোলক। আমি শাড়ী-পরা মেমসায়েব। কাউকে মারি না। শুধু বেশি দুষ্টুমি করলে মাঝে মাঝে তোমার এই ছোটবাবুর কাণ ম'লে দিই।

কথাটা সত্য কিম্বা পরিহাস ঠিক বুঝতে না পেরে গোলকও বোকার মতো হাসতে লাগলো।

মহেন্দ্র বললে, তারপরে, গোলকদাদা, তোমার দরকারটা তো বললে না।

গোলক একটু দ্বিধা করলে। একবার পেনিলোপীর, একবার মহেন্দ্রের দিকে চেয়ে খানিকটা সাহস পেয়ে আলোয়ানের ভিতর থেকে একখানা থান ধুতি সন্তর্পণে বার ক'রে বললে, বাগ্দীতে বামুনের মেয়েকে একখানা কিনে দিলে তাতে দোষটা কি?

মহেন্দ্র জবাব দেবার আগেই পেনিলোপী বলে, কিছু দোষ হয় না গোলক। তুমি স্বচ্ছন্দে দিয়ে এস না।

—নিলো না।—গোলকের গলা কান্নায় বন্ধ হয়ে এল। বললে,—বাইরের লোক দুজন খাবে। তোমাকে নিতে হবে না দিদিমণি, শুধু আজকের দিনটি এইখানি পড়ে ওদের পাতে ভাত দিও। তারপরে ইচ্ছে হয় ছেড়ে দিও, আমি মাথায় ক'রে নিয়ে গিয়ে ঝাঁপে তুলে রেখে দোব। শুধু এই একটি দিনের জন্তে দিদিমণি।

কান্নায় গোলকের কঙ্কালসার প্রকাণ্ড দেহটা থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো। কোনোরকমে বললে, তা কিছুতেই নিলে না।

মহেন্দ্র অনেকদিন থেকেই প্রাণপণে নিজেকে সম্বরণ ক'রে আসছিল। আর পারলে না। একেবারে স্ত্রীলোকের মতো কেঁদে উঠলো।

চীৎকার ক'রে বললে, কেন দিতে গিয়েছিলে গোলকদাদা? তুমি কি জানো না, ও কত নিষ্ঠুর! ওর দয়ামায়া কিছু নেই।

গোলক বললে, সত্যি ছোটবাবু। দয়ামায়া কিছুই নেই। নইলে বাঁড়ুয্যে মশায়ের দেহ রাখার পর থেকে আমি কাঙালের মতো যা ক'রে ওর পিছু পিছু ঘুরেছি, তাতে পাথরের দেবতারও মন গলতো, কিন্তু ওর মন গলে নি।

গোলক আর থাকতে পারলে না। কাপড়খানি বগলে চেপে পাগলের মতো টলতে-টলতে বেরিয়ে গেল। মহেন্দ্র রুমালে চোখ ঢেকে পাশের ঘরে চ'লে গেল কান্না চাপতে। পেনিলোপী অভিভূতের মতো কিছুক্ষণ ব'সে থেকে আপন মনেই বললে, অদ্ভুত!

পেনিলোপী একাই গেল নিমন্ত্রণে।

স্বর্ণ এগিয়ে গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা ক'রে দোতলার বারান্দায় বসালো। জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুরপো কই?

—তোমার ঠাকুরপো?—পেনিলোপী হাসতে হাসতে বললে,—সে আসবে এই গাছ-গাছড়া খেতে? সে এতক্ষণ ইব্রাহিমের হাতে ফাউল-কাটলেট খাচ্ছে।

স্বর্ণ কিন্তু এই রসিকতায় ঠিক যোগ দিতে পারলে না। তার মুখখানা অন্ধকার হয়ে গেল।

বললে, এমন তো হবার কথা নয়! আমার হাতে খেতে সে যে ভয়ানক ভালোবাসে।

পেনিলোপী তেমনি হাসতে হাসতে বললে, তার প্রমাণ তো পাচ্ছি না।

স্বর্ণ বলতে লাগলো: গেলবারে যখন এসেছিল কত রাগারাগি! শেষে তার দুপুরের খাবার এইখান থেকেই যেত। তুমি তাকে ব'লেছিলে তো ভাই?

পেনিলোপী বললে, কী আশ্চর্য! পয়সা খরচ নয়, কিছু নয়, মুখের বলা! এই সামান্য বিষয়েও কি আমার উপর তুমি ভরসা করতে পারো না দিদিভাই?

স্বর্ণ আর কিছু বললে না। মুখখানা ভার ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। পাশেই নির্বিকার দাঁড়িয়ে গায়ত্রী। পেনিলোপী চেয়ে দেখলে, তার মুখে দুঃখ-হর্ষ, আনন্দ-উদ্বেগ, কিছুরই চিহ্ন নেই। যেন কিছুই হয় নি এমনি নির্লিপ্তভাব।

পেনিলোপী মনে মনে বললে, তুমি পাথরের দেবতাই বটে। মনে তোমার ঢেউ খেলেই না। তুমি জমাট-বাঁধা নদী।

গায়ত্রী জিজ্ঞাসা করলে, তাহ'লে জায়গা ক'রে দিই বৌদি?

অন্যমনস্ক ভাবে স্বর্ণ বললে, দাও।

—এই দোতলার বারান্দাতেই ক'রে দোব কি?

এবারে স্বর্ণ রেগে গেল।

বললে, এখানে হবে না তো কি উঠোনে জায়গা করা হবে? তুই দিন দিন বোকা হচ্ছিস কেন গায়ত্রী?

গায়ত্রী রাগ করলে না। ব্যস্তভাবে জায়গা করতে গেল।

পেনিলোপী তার হাতের আসনগুলো কেড়ে নিয়ে বললে, কেমন ক'রে জায়গা করতে হবে দেখিয়ে দিই।

ব'লে ওদিকে পাশাপাশি একটুখানি ছাড়াছাড়ি ক'রে দুখানা আসন পাতলে। তার থেকে অনেক দূরে, তারই সামনা-সামনি আর একখানা আসন পাতলে।

বললে, ওই দুটো তোমাদের জায়গা, এইটে আমার। কেমন ক'রে যে তোমরা খাও, কিছুই জানি না। এইখান থেকে দেখে শিখব, আর খাব, কেমন?

পেনিলোপী হাসলে, গায়ত্রীও।

পেনিলোপী হেসে জিজ্ঞাসা ক'রলে, এত দূরে বসলেও কি তোমাদের জাত যাবে ভাই?

গায়ত্রী হেসে বললে, না।

তারপর স্বর্ণর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আমার এখন বসা কি ঠিক হবে বৌদি?

—না, তুমি রাত্রি বারোটার পরে বসবে। বেলার দিকে চেয়ে দেখেছ?

গায়ত্রী একটা ঢোঁক গিলে বললে, তা নয়, বলছিলাম, পরিবেশন করবে কে?

—পরিবেশনের কি আছে? থালা সাজিয়ে নিয়ে আসব। তারপর হাত ধুয়ে একসঙ্গে ব'সে পড়ব। এর মধ্যে ভাববার কি আছে? নিচে চল।

স্বর্ণ আর গায়ত্রীতে মিলে থালা সাজিয়ে নিয়ে এল। ঝি জলের

গ্লাস দিয়ে গেল। একটু পরে হাত ধুয়ে এসে পেনিলোপীকে ওরা ডাকলে, এস ভাই।

পেনিলোপী খেতে বসবে কি, আয়োজন দেখেই চক্ষুস্থির! প্রকাণ্ড বড় থালার মধ্যেখানে ফুলের মতো একমুঠো ভাত। চারদিকে সাজানো বিবিধ ব্যঞ্জন। তার চারদিকে আবার সারে সারে ছোট বড় মাঝারি নানা রকমের বাটি। দই। মিষ্টিই আছে পাঁচ-ছয় রকমের।

বললে, করেছ কি দিদি! এত খাবে কে?

—দেখ না কে খায়! বোসো তো।

—না, না। এ যে অনেক নষ্ট হবে।

—তার জন্যে চিন্তা করো না। অনেক নষ্ট না হ'লে আমাদের দেশে খাওয়ানোই হয় না।

—তাই না কি? এ ভারি অন্যায়।

এদেশের বড় লোকদের খাওয়া এবং খাওয়ানো সম্বন্ধে মহেন্দ্রের সেই উক্তিটা পেনিলোপীর মনে পড়লো। বুঝলো এমনিই এখানে হয়। আর কথা না বাড়িয়ে সে ওদের দেখে-দেখে খেতে আরম্ভ করলে। হাতে ক'রে এর আগে সে কখনও খায়নি। খেয়ে দেখলে, বেশ আরাম তো! কাঁটা চামচের চেয়ে ভালো। বসন্ত মাঝে মাঝে বলে হাতে না খেলে পেট ভরে না। মিথ্যে বলে না!

স্বর্ণ বললে, ঠাকুরপোকে বোলো, সে যে এলো না, এর শাস্তি তোলা রইলো।

—বলব।

—বোলো তারই জন্যে এই শীতে ভোরবেলায় স্নান ক'রে আমি রান্নাঘরে ঢুকেছিলাম। আর সে এলো না।

—স্নান না ক'রে কি তোমরা রাঁধ না দিদি?

—তাই রাঁধে? লোকে খাবে, পবিত্র হ'য়ে না রাঁধলে তৃপ্তি হবে কেন?

গায়ত্রী বললে, খাবার পরিচ্ছন্ন হ'লেই তোমাদের কাজ মিটে যায়। আমাদের কিন্তু তাতেই চলে না। রান্না পবিত্র হওয়া চাই। ভগবানকে নিবেদন ক'রে খাই কিনা।

ব্যাপারটা পেনিলোপী বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলো।

জিজ্ঞাসা করলে, ভগবান্ কি খেতে পারেন যে, তাঁকে খাবার নিবেদন কর?

গায়ত্রী বললে, কি জানি তিনি কি পারেন আর কি পারেন না। কিন্তু আমরা যা কিছু পাই তাঁরই দয়ায় পাই। তাই তাঁকে উৎসর্গ না ক'রে কিছু ব্যবহার করি না। নতুন কাপড় পরবার আগে, একগাছি সুতো তাঁকে দিয়ে তবে কাপড়খানি পরি। এই সুতোর টুকরোখানি না পেলে কি তিনি উলঙ্গ হয়ে থাকেন? তা নয়। তবু এই উপলক্ষে তাঁকে একবার স্মরণ করাও ত হয়।

পেনিলোপী খুশি হ'ল। বললে, বেশ ভালো ব্যবস্থা তো?

এতক্ষণ পেনিলোপী খেয়াল করেনি। এখন দেখ্‌ল গায়ত্রী আর সুবর্ণও ঠিক পাশাপাশি ব'সে নেই। দুজনের আহার্যও ঠিক এক বস্তু নয়। সুবর্ণর থালা ঠিক পেনিলোপীর মতোই সাজানো। কিন্তু গায়ত্রীর পাতে কেবলমাত্র দু'তিনটা তরকারী এবং এক বাটি দুধ। তাছাড়া আর কিছু নেই।

দেখে পেনিলোপীর ভারী বিশ্রী লাগলো। সুবর্ণ আর গায়ত্রীর আহার্যের এই তারতম্য দেখে তার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা না ক'রে পারলে না, আমি না হয় খৃষ্টানের মেয়ে দিদি, আমার সঙ্গে যেন খেলে না। কিন্তু গায়ত্রীর সঙ্গেও কি তুমি খাও না?

সুবর্ণর মুখে একটা কোমল বিষণ্ণ ছায়া নেমে এল। বললে, ও যে বিধবা ভাই, মাছ-মাংস তো খায় না। সেই জন্যেই দূরে বসেছে।

পেনিলোপীর মুখটা প্রসন্ন হ'ল। গায়ত্রীর পাতের দিকে চেয়ে মনে

এমনও সন্দেহ হয়েছিল, বেতনভুক পাচিকা বলেই বুঝি তাকে দূরে সরানো হয়েছে এবং আহার্যের ব্যবস্থাও পৃথক করা হয়েছে।

সুবর্ণ জিজ্ঞাসা করলে, আমাদের রান্না কেমন লাগছে?

সত্য কথা বলতে গেলে, এ রান্নায় এখনও তার জিহ্বা অভ্যস্ত হয়নি। তবু মন্দ লাগছিল না। কিন্তু বলবার সময় ভদ্রতা রক্ষা করে উচ্ছাসভরে বললে, চমৎকার তোমাদের রান্নার পদ্ধতি! খাসা খেতে হয়েছে। আমাকে দু'একটা রান্না শিখিয়ে দিও তো। বিশেষতঃ গলদা চিংড়ির এইটে। ভারি সুন্দর হয়েছে।

খাওয়া-দাওয়ার শেষে বিদায় নেবার সময় পেনিলোপী সুবর্ণকে জিজ্ঞাসা করলে, মহিনের উপর আর কিছু আদেশ আছে তোমার? থাকলে বল, তাকে গিয়ে বলব।

সুবর্ণ বললে, আর যা আছে তা দেখা হলে তাকেই বলব। তাকে একবার পাঠিয়ে দিও বরং।

—আচ্ছা।

ব'লে পেনিলোপী চলে গেল। যাবার সময় গায়ত্রীকে একটা সম্বোধনও করলে না।

বাগান বাড়ীতে ফিরে গিয়ে পেনিলোপী দেখে একখানা ঈজি-চেয়ারে চিৎ হ'য়ে প'ড়ে মহেন্দ্র খবরের কাগজ পড়ছে।

পেনিলোপীর পায়ের শব্দে মাথা তুলে মহেন্দ্র বললে, Good afternoon, Mrs. Lahiri.

—Very good afternoon!

—খেলে কি রকম?

—প্রচণ্ড! উঃ কি আয়োজনই না করেছিল! এত বড় একটা থালার তিন দিক তো ভর্তি, তার উপর সারি সারি বাটি! সে কত!

ঈজি-চেয়ারের উপর ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে মহেন্দ্র বলে উঠলো : থাম, থাম! কী বললে? থালা?

—থালাই তো বলে তাকে? বেল-মেটালের?

—হ্যাঁ, থালাই বলে। তাইতে খেতে দিয়েছিল তোমাকে? নরেন মুখুয্যের গেল এক প্রস্থ বাসন!

—কেন?

—ও থালা-বাসন আর ঘরে ঢুকবে না। ফেলে দেওয়া হবে। তথাপি তুমি সত্যিই ভাগ্যবতী পেনিলোপী। তোমাকে আমার হিংসে হচ্ছে।

—কেন?

—আমি চীনে-মাটির বাসন ছাড়া আর কিছু পাইনি; তোমার ভাগ্যে জুটেছে কাঁসার থালা।

পেনিলোপী বললে, আজ তুমি গেলে তোমার ভাগ্যেও জুটতো।

—না, জুটতো না। কোনোদিন জোটে নি, আজও তার ব্যতিক্রম হ'ত না। তারপর আর কি খবর বল।

—খবরের মধ্যে তোমার বৌদি তোমার উপর চটেছেন।

—কেন?

—নেমন্তন্ন রক্ষা করনি ব'লে।

—কিন্তু নেমন্তন্ন তো আমি গ্রহণ করিনি।

—তুমি করনি, কিন্তু তোমার হয়ে আমি করেছিলাম। তাঁর হাতের রান্না খেতে ভালোবাস ব'লে এই শীতের ভোরে উঠে তিনি স্নান করে রান্নাঘরে ঢুকেছিলেন। আর কত রান্না রেঁধেছিলেন! কিন্তু তুমিই গেলে না!

—আমার ভাগ্য পেনিলোপী!

—তোমাদের দোতলার বারান্দায় একসঙ্গে সব খেতে ব'সেছিলাম, তোমার বৌদি, গায়ত্রী, আমি। তুমি থাকলে তুমিও বসতে।

—না। কারণ আমাদের পরিবারে স্ত্রী-পুরুষে একসঙ্গে খাওয়ার রেওয়াজ নেই। তারপরে আর কি কথা হ'ল?

—কথা? কথা বিশেষ কিছু নয়। এই সব রান্না-খাওয়ার গল্প।

—মাত্র?

—মাত্র।

মহেন্দ্র অন্য কথা শুনতে চায়। পেনিলোপী তা বোঝে। কিন্তু তার বলবার কথা কিছু নেই। খাওয়ার পরে গায়ত্রীকে একলা পাবার জন্যে পেনিলোপী অনেকবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার মনোগত অভিপ্রায় বুঝতে পেরেই হোক, অথবা না বুঝতে পারার জন্যেই হোক, গায়ত্রী কেবলই তাকে এড়িয়ে গেছে। সুতরাং মহেন্দ্রকে তার বলবারও কিছু ছিল না। মহেন্দ্র বোধ করি তার মনের কথা অনুমান করলে। এবং এ নিয়ে আর জেদ করলে না।

বললে, চল। মোটরটা নিয়ে একটু ঘুরে আসা যাক।

—সেই ভালো।—পেনিলোপী বললে,—ওটা আমার খেয়ালই হয়নি। চল, চারদিকটা একবার দেখাও হবে।

মোটরটা বের ক'রে পেনিলোপী নিজেই ড্রাইভ করতে লাগলো। মহেন্দ্র বসলো তার পাশের আসনে। মেয়ে মানুষে মোটর চালায়, এই দৃশ্য দেখবার জন্যে রাস্তার দুধারে কাতার দিয়ে লোকে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

একুশ

মহেন্দ্রের মনে একটা আশা ছিল, গায়ত্রী অন্ততঃ একবার তার সঙ্গে দেখা না ক'রে থাকতে পারবে না। এর আগের বারও দু'দিন সে নিজে এসে মহেন্দ্রের সঙ্গে দেখা ক'রে গেছে। কিন্তু সকাল কেটে দুপুর আসে, দুপুর কেটে বিকেল, তারপর রাত্রি আসে। মুহূর্তগুলি যতই বয়ে যায়, মহেন্দ্রের আশাও তত ক্ষীণ হয়।

অবশেষে মঙ্গলবার সকালে মহেন্দ্র বললে, আর নয় পেনিলোপী। বসন্তর কষ্ট হচ্ছে। কলকাতায় বহু কাজই পড়ে আছে। কাল সকালে রওনা দেওয়া যাক।

—বেশ তো। আজ বিকেলে কথা আছে তোমার বৌদি আর গায়ত্রীকে নিয়ে মোটরে একটু বেড়াতে যাব।

—সেই ব্যবস্থা হয়েছে বুঝি?

—হ্যাঁ, তোমার বৌদির ভয়ানক সখ। একদিন নাকি তোমার সঙ্গে গিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ। দাদার উৎপাতে কোথাও তো বেরুতে পায় না। নিয়ে যাও বেড়াতে।

—তুমি যাবে? চল না।

—না।

—এর মধ্যে একদিনও ওবাড়ী যাওনি বোধ হয়?

উদাসভাবে মহেন্দ্র বললে, কই আর গেলাম!

পেনিলোপী আর কিছু বললে না।

হঠাৎ এক সময় মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, তুমি সাঁতার জানো পেনিলোপী ?

—জানি। কেন ?

—চল। আজ নদীতে সাঁতার কেটে আসা যাক। হাত-পায়ের গাঁটগুলো যেন জমে যাচ্ছে।

পেনিলোপী উৎফুল্ল হয়ে বললে, চলো। কিন্তু আমার পোষাক নেই যে! কিনতে পাওয়া যাবে এখানে ?

—পাগল! তার দরকারও নেই। মেয়েদের প্রকাশ্যে সাঁতার কাটাই তো এখানে একটা ভীষণ ব্যাপার। তার উপর সুইমিং-কষ্ট্যুম পরলে তো আর রক্ষে নেই।

পেনিলোপী বললে, কষ্ট্যুমে কাজ নেই তাহলে। শাড়ীতেই যা সাঁতার কাটব, তা তুমি পারবে না।

—তাই নাকি ? চলো বিদেশিনী, সাঁতার কি ক'রে কাটতে হয়, তোমাকে শিখিয়ে দিই।

দুজনে তখনই বেরিয়ে পড়লো।

পেনিলোপীর সঙ্কোচের বালাই নেই। আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে মহেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে সেও নদীর উপর থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। স্নান করবার জন্যে যারা ঘাটে ছিল তারা তো অবাক! পুরুষ মানুষের গা ঘেঁষে মেয়েরা যে এমন ক'রে সাঁতার দিতে পারে এ তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। তারা আমোদ দেখতে দাঁড়িয়ে রইলো আর ওদের দুজনকে নিয়ে যে আলোচনা আরম্ভ করলে, তা কানে শোনা যায় না।

বহু দূর অবধি ওরা দুজনে সাঁতার কেটে চলে গেল।

খালি গায়ে পেনিলোপী মহেন্দ্রকে কখনও দেখে নি। বুঝলে মহেন্দ্র দুর্বল নয়। জিজ্ঞাসা করলে, তুমি তো ব্যায়াম কর না মহিম। কিন্তু চমৎকার তোমার দেহ। এই গ্রামের লোক বলে মনেই হয় না।

মহেন্দ্র হাসলে। পেনিলোপীর দিকে সে চাইতেই পারছিল না। মাঝে মাঝে তার দেহের যেটুকু আভাষ পাচ্ছিল তাতেই তার মনে হচ্ছিল, বাঙালী মেয়ের দেহের গড়ন এমনি বলিষ্ঠ, এমনি সুন্দর করে হবে।

স্রোতের বিরুদ্ধে চলছে ওরা। আরও খানিক যাওয়ার পরে পেনিলোপী বললে, আর নয়। অনেক দূর এসে গেছি। চল এইবার ফিরি।

—তা হবে না পেনিলোপী। হার তুমি যতক্ষণ না স্বীকার করছ, ততক্ষণ ফিরব না।

হার পেনিলোপী কিছুতেই মানবে না। প্রাণপণ শক্তিতে সে সাঁতার কেটে চলে। কিন্তু বেশিক্ষণ পারলে না। শেষকালে বললে, হার স্বীকার করছি মহিন। চল ফিরি। অনেক দিন অভ্যাস নেই, হাত ক্লান্ত হয়ে আসছে।

—ধরব ?

—ধর একটু।

ফেরবার সময় মহেন্দ্রের কাঁধে ভর দিয়ে পেনিলোপী অনেকখানি এল। গ্রামের মধ্যে যারা অতিরিক্ত উৎসাহী তারা তাও দেখলে।

ওরা গ্রাহ্যও করলে না। নদীর কাছেই বাগানবাড়ী। ওরা ভিজে কাপড় সটপট করতে-করতে হাসতে হাসতে বাগানবাড়ী চলে গেল।

কাপড় ছেড়ে বাইরে এসে বসতেই নরেন এল।

ভূমিকায় প্রথমেই নানা কাজের ভিড়ে আসতে না পারার জন্যে নরেন পেনিলোপীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলে। তারপর মহেন্দ্রের দিকে ফিরে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, এদিকে ব্যাপার তো বিশেষ সুবিধা মনে হচ্ছে না মহিন।

—কিসের ব্যাপার ?

—এই গ্রামের ব্যাপার আর কি! মুসলমান পাড়ার ছেলেরা ক'দিন থেকে মসজিদে খুব মিটিং করছে।

—কিসের মিটিং?

—পাকিস্তানের। মধ্যে মধ্যে 'মারকে লেঙ্গে' 'লড়কে লেঙ্গে' ধ্বনিও শুনতে পাই।

—গোলমাল হবে বলে কি আশঙ্কা করছেন?

—গোলমাল হবার তো কথা নয়। অধিকাংশই শান্তিপ্রিয় নিরীহ মুসলমান। কিন্তু ছেলেদের মেজাজ যেন গরম-গরম।

—ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানিয়ে রাখা উচিত।

—তাই ভাবছি। এর পর যেদিন সদরে যাব, জনসন সায়েবকে জানিয়ে আসব ভাবছি।

মহেন্দ্র আশ্বাস দিলে, ভয়ের কারণ কিছু নেই। এদিকে কোনো গোলমাল হবে না।

নরেন পেনিলোপীর দিকে চেয়ে বললে, আপনারা আজ বেড়াতে যাচ্ছেন তাহলে?

—ইচ্ছা আছে।

—যান। আপনি সঙ্গে থাকলে ভয়ের কিছু নেই। তুমিও যাচ্ছ নাকি মহিন?

মহিন বললে, আজ্ঞে না।

—গেলে পারতে। একজন ব্যাটাছেলে থাকা ভালো।

—উনি থাকলে কিচ্ছু দরকার হবে না।—ব'লে মহেন্দ্র পেনিলোপীর দিকে চাইলে।

তারপর বললে, আমার একটু কাজও আছে।

—তা বেশ, তা বেশ।

ব'লে আর এক দফা নমস্কার ক'রে নরেন চ'লে গেল। পেনিলোপী

জিজ্ঞাসা করলে, এই যে তোমাদের দেশের সাম্প্রদায়িক বিরোধ—এর কি কোনো মানে হয় মহিন?

—না। কিন্তু পরাধীন দেশকে এ দুর্ভোগ পোহাতেই হবে। এর জন্যে হিন্দুও দায়ী নয়, মুসলমানও দায়ী নয়। তাদের পরাধীনতাই তাদের মাথায় আনছে যত রাজ্যের মূঢ়তা, দুর্বুদ্ধি এবং বিভ্রান্তি। ইংরেজ চলে না গেলে এর থেকে তারা মুক্তি পাবে ব'লে আমরা আশা করি না। ইংরেজের আওতার বাইরে নেতাজির অধীনে আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলতে কতক্ষণ লেগেছিল?

কথাটা পেনিলোপীর মনে লাগলো। বললে, ঠিক বলছ মহিন। ইউরোপেও এর নজিরের অভাব নেই। স্বাধীন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো জার্মানীর দখলে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে গজিয়ে উঠলো বিশ রকম দল, ঘনিয়ে উঠলো কলহ। এমনিই হয়।

মহেন্দ্র বললে, এর জন্যে আমি খুব ভয় পাই না পেনিলোপী। এগুলো বুদ্বুদ, ঘোলালেই ওঠে। এই বিরোধ হ'ল দুর্বলের অস্ত্র। কিছুক্ষণের জন্যে তালপাতার অস্ত্র ঘুরিয়ে তারা রঙ্গমঞ্চে আস্ফালন করে মাত্র। তাদের হারতেই হবে। জেতে তারাই যাদের কণ্ঠে বাজে কল্যাণ এবং শান্তির বাণী। তারাই ইতিহাস সৃষ্টি করে। ইউরোপের কথা তুলছিলে পেনিলোপী, সেইদিকেই চাও। হিটলারের আকস্মিক আবির্ভাব হ'ল একটা অতিকায় দৈত্যের মতো। মুখে তার লেবেনস্রাম আর ব্লিৎসক্রাইগ, ঘৃণা বিদ্বেষ আর বিরোধের অগ্ন্যুদ্গার! কিন্তু শেষ কি হ'ল? অথচ তার পাশের রাশিয়ার দিকে চাও। নিপীড়িত মানুষের জন্যে সে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছে নতুন রাষ্ট্র। হিটলারের বজ্রাঘাত তাকে মারতে পারলে না, বরং আরও বলিষ্ঠই করে তুললে।

একটা সিগারেট ধরাবার জন্যে মহেন্দ্র থামলে।

তারপর বললে, গৃহযুদ্ধের নামে সকলের মুখেই দেখি শঙ্কার ভাব।

আমি কিন্তু এতটুকু ভয় পাই না। লোকক্ষয়, ধনক্ষয় হয়তো অনেক হবে। কিন্তু তার বিনিময়ে যে শক্তি এবং পাথেয় আমরা সঞ্চয় করব, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ জয়যাত্রার পথে তার মূল্য অনেক। তার পরেই দেখো, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সত্যিকার মিলন প্রতিষ্ঠিত হবে। তারা বুঝবে, কি রাষ্ট্রক্ষেত্রে, কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একজনকে ছেড়ে আর একজন এক পাও চলতে পারে না। একই মহৎ এবং বৃহৎ স্বার্থে অনুপ্রাণিত হয়ে সেইদিন তারা পরস্পর পরস্পরকে যথার্থ ভালোবাসতে শিখবে।

বিকেলে পেনিলোপী বেরিয়ে গেল মোটর নিয়ে। মহেন্দ্র বাগান-বাড়ীতেই ব'সে রইল।

একবার মনে করলে গোলকের বাড়ীর দিকে যায়। তারপর ভাবলে, থাকগে। খবরের কাগজগুলো উলটে-পালটে দেখতে লাগলো। কিন্তু তাও ভালো লাগলো না। খবরগুলোর মধ্যে যেন সজীবতা নেই, তার সঙ্গে আজ সে কিছুতেই হৃদয়ের সংযোগ করতে পারছে না। বারান্দায় পায়চারী করতে লাগলো। শেষে আলোয়ানটা জড়িয়ে গোলকের বাড়ীর দিকেই বেরুলো।

জীর্ণ একখানি কুঁড়ে। চালে সর্বত্র খড় নেই। যেখানে আছে সেখানেও এত পাৎলা যে হাত দিলে ধুলোর মত ঝরে পড়বে। গেল বর্ষাটা রোখবার জন্যে নিরুপায় হ'য়েই বোধ হয় গোলক কতকগুলো তালের বাগড়া এখানে-ওখানে রেখেছিল। সেগুলো এখনো রয়েছে। কিন্তু বৃষ্টি কতখানি, আটকেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ ঘরের দেওয়ালগুলো ঠিক আস্ত নেই দেওয়ালের গা বেয়ে ধারা নেমেছিল জলের। তার দাগ রয়েছে। দেওয়ালের উপরাংশ বৃষ্টিধারায় পাৎলা হয়ে গেছে। কোথাও কোথাও ফুটোও হয়েছে।

এই কুঁড়ে! আর সামনে এক ফালি উঠান, তার বেড়ার বালাই নেই একদিন এই কুঁড়েই তার কত পরিচিত ছিল! এই উঠানে, ওই ঘরে শিশুকালে কত উৎপাত করেছে! সেই বুড়ীমাও নেই, তার সমবয়সীর দলেরও অনেকে মারা গেছে। যারা বেঁচে আছে তাদের এখন চিনতেও কষ্ট হয়।

ঘরের দরজা নেই। একটা ঝাঁপ আছে, তা বন্ধ।

উঠানে দাঁড়িয়ে মহেন্দ্র চারিদিকে চাইলে। অধিকাংশ বাড়ীই পতিত। কতকগুলোর দেওয়াল যেন বাইরের পৃথিবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই এখনও উদ্ধত, উলঙ্গভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুর্বলতরেরা পৃথিবীর কোলে আত্মসমর্পণ করেছে।

পাড়া জনশূন্য। এই সময় আগে যেখানে উঠানে-উঠানে লোক গিসগিস করতো, আজ সেখানে জীবনের স্পন্দনমাত্র নেই। খানিকটা দূরে একটা বাড়ীর উঠানে একটা নয়-দশ বছরের উলঙ্গ মেয়ে পিছন ফিরে কি যেন করছিল।

তাকেই সে চীৎকার ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, ওরে শুনছিস, গোলক কোথায় গেল জানিস?

মেয়েটি মনুষ্যকণ্ঠের জন্যে যেন প্রস্তুত ছিল না। চমকে পিছন ফিরে চেয়ে মহেন্দ্রকে দেখেই, বোধ হয় নিজের নগ্নতা ঢাকবার জন্যেই, দ্রুতবেগে পাশের আতাগাছটার আড়ালে গিয়ে লুকোলো।

মহেন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করলে, গোলক গেল কোথায় জানিস?

আতাগাছের আড়াল থেকেই মেয়েটি শীর্ণকণ্ঠে চীৎকার করে উত্তর দিলে, সে বাড়ীতে নাই!

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। গেল কোথায় জানিস?

—মদ খেতে গিয়েছে।

ভিতর থেকে কে যেন মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলে, কে রে ক্ষ্যান্ত? কার সঙ্গে কথা কইছিস?

কান্ত ফিসফিস ক'রে বললে, ছোটবাবু।

ভিতর থেকে বড় মেয়েটি বললে, এখুনি, ফিরবে। আপনি যাও। এলেই তাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দোব।

—তাই দিও।

মহেন্দ্র সেখান থেকে বেরিয়ে মাঠে এসে পড়লো। শীতকালে বিকালের এই রোদটা তার বড় ভালো লাগে। উজ্জ্বল সোনালী রোদ ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। মহেন্দ্র ঘুরতে ঘুরতে নদীর ঘাটের পথটা ধরলে।

সেই করবী গাছটা।

তার থেকে একটু দূরেই বেণী বাঁড়ুয্যের খিড়কি। বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে তাদের ঈষদ্‌মুক্ত খিড়কির দরজা দেখা যাচ্ছে। মহেন্দ্র অকারণেই চেয়ে রইলো সেই দিকে।

হঠাৎ মনে হ'ল, ঘড়া কাঁখে কে যেন একটি মেয়ে সেই বাড়ী থেকে বেরুচ্ছে। বাঁশ ঝাড়ের আড়ালটা কাটতেই চিনতে পারলে: গায়ত্রী। নদীর ঘাটে জল নিতে আসছে বোধ হয়।

মহেন্দ্র স'রে যাবে কি না ভাবছে, এমন সময় গায়ত্রীও তাকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালো। তারপরে হাত-ইসারায় ডাকলে।

মহেন্দ্র একটু দ্বিধা করলে।

কিন্তু গায়ত্রী আবার ডাকতেই ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হ'ল।

গায়ত্রী ঘড়াটা নামিয়েছে। কিন্তু কাপড় ভিজে সপ সপ করছে।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, তুমি যাওনি যে বেড়াতে?

গায়ত্রী বললে, না। মায়ের জ্বর। ঘরে জল নেই এক ফোঁটা। যাচ্ছিলাম আনতে। তারপর ছোট দুটি ভাই, তাদের জন্যে দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়েও দিতে হবে। তাই পারলাম না যেতে।

—তা এই শীতে ভিজে কাপড়ে বেরিয়েছ যে? আর কাপড় নেই বুঝি?

গায়ত্রী হেসে বললে, আছে আরও একখানা।

—তারও অবস্থা আশা করি এই রকমই জমকালো ?

ছেঁড়া কাপড়ের উল্লেখে জড়সড় হয়ে গায়ত্রী কাপড়খানা টেনে-টুনে নিজেকে সম্বৃত ক'রে নিলে।

হেসে বললে, প্রায় এই রকমই। শোনো, আর কতদিন থাকবে এখানে ?

তীক্ষ্ণকণ্ঠে মহেন্দ্র বললে, কেন বলো তো ? আমার যাওয়া-না-যাওয়ার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক ?

—আছে একটু। আজ সকালে মেমটাকে নিয়ে নদীর ঘাটে যে কেলেঙ্কারী করেছ, তাতে গাঁয়ে ঢি ঢি পড়ে গেছে। তুমি না হয় লজ্জা-সরমের মাথা খেয়েছ। কিন্তু আমাদের তো লজ্জা আছে। তোমায় পায়ে পড়ি মহিনদা, আর এখানে থেকে আত্মীয়-স্বজনের চোখের সামনে ঢলাঢলি কোরো না। এইবারে কলকাতা চলে যাও।

শেষের দিকটায় গায়ত্রীর কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো।

মহেন্দ্র হাসলে।

তার মুখে-চোখে একটা অস্বাভাবিক ক্রূরতা ফুটে উঠলো। বললে, ঢি ঢি তো এ গাঁয়ে কথায় কথায় পড়ে গায়ত্রী। তোমাকে নিয়েও আমার সম্বন্ধে কম ঢি ঢি পড়ে নি। তবু তার মধ্যে কিছু সত্যি ছিল। তাতে তো আমাকে তাড়াবার জন্যে এত ব্যস্ত হওনি গায়ত্রী, আর এই মিথ্যে ঢি ঢি-তে এত কাতর হচ্ছ কেন ?

—এ মিথ্যে ? অতগুলো লোক সব ভুল দেখলে ?

—তারা হয়তো ঠিকই দেখেছে গায়ত্রী। তবু এ যে সত্যি হতে পারে না সে তো তুমি জানো।

একবার অস্ফুটস্বরে ওর কথার প্রতিধ্বনি ক'রে গায়ত্রী বললে, আমি জানি! একবার স্থির দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চাইলে। তারপর বললে, বড় শীত করছে, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। পথ ছাড়। এইবার যাই।

মহেন্দ্র পথ ছাড়লে না। নির্নিমেষে ওর দিকে চেয়ে রইলো। ধীরে ধীরে বললে, অনেক দিন পরে দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। মনে হচ্ছে, অনেক জন্ম পরে। আজকে আমাকে কি কিছুই তোমার বলবার নেই গায়ত্রী?

গায়ত্রী প্রথমে জবাব দিলে না। মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর বললে, না।

মহেন্দ্র আর কিছু বললে না। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওদিকের মাঠ দিয়ে হন হন ক'রে চলতে লাগলো। পিছন দিকে একবারও ফিরে চাইলে না।

কিছু দূর গিয়েই মহেন্দ্রের চোখে পড়লো, টলতে টলতে এবং বিড় ক'রে কি যেন বকতে বকতে গোলক এই দিকেই আসছে। মহেন্দ্রের খেয়াল হ'ল, আর একটু আগে বাঁদিকের মোটা আলটাই বাগদী পাড়া যাওয়ার পথ। সে একটু এগিয়ে গিয়ে আলটার উপর দাঁড়ালো।

গোলক আপন মনেই আসছিল। হঠাৎ সামনে চেয়ে মহেন্দ্রকে দেখে থমকে দাঁড়ালো।

—ছোট বাবু?

গোলক সেইখানে ভক্তিভরে প্রণাম করতে গিয়ে সেইখানেই শুয়ে পড়লো, আর উঠতে পারলে না। নেশার মাত্রা একটু বেশি হয়েছে।

অবস্থা দেখে মহেন্দ্র হেসে ফেললে।

বললে, নেশাটা একটু বেশি ক'রে ফেলেছ গোলক দা। না ধরলে বোধ হয় উঠতে পারবে না।

গোলক অম্লানবদনে বললে, না বোধ হয়।

মহেন্দ্র তাকে উঠিয়ে বসালে।

গোলক হাংড়ে-হাংড়ে ওর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, সেইদিনকার মতো আর একটিবার বোসো ছোটবাবু, দুটো প্রাণের কথা কই।

গদগদ কণ্ঠে বললে, সব মরে হেজে গেল ছোট বাবু, দুটো প্রাণের কথা বলি এমন লোক নাই। সেই হারামজাদী মাগীটা শেষ পর্যন্ত ছিল, তা সেও মরে গেল।

পরলোকগত স্ত্রীর সম্বন্ধে এই সপ্রেম উক্তি ক'রে গোলোক পৃথিবীর দুরবস্থায় হতাশ ভাবে হাতের তালু ওলটালে। কিন্তু মাঠের মধ্যে এই মাতালটার সঙ্গে ব'সে দুটো প্রাণের কথা কইবার প্রস্তাবে মহেন্দ্রের তালু শুকিয়ে উঠলো।

বললে, সে সব নিরিবিলি কাল হবে গোলোক দাদা। আজকে বাড়ী যাও। তোমার বাড়ী আমি গিয়েছিলাম যে!

—আমার বাড়ী তুমি গিয়েছিলে?—গোলক উঠছিল, আবার ব'সে পড়ল,—ওরে আমার রাখালরাজা! ওরে আমার রাখালরাজা!

বলে আর কাঁদে আর হাংড়ে-হাংড়ে মহেন্দ্রের পায়ের ধুলো নেয়। মহেন্দ্র প্রমাদ গণলে।

গোলক বললে, আমার বাড়ী কেন ছোটবাবু?

—কাল আমি ক'লকাতা যাচ্ছি।

গোলক আপন মনে বিড় বিড় ক'রে বললে, তাই যাও। এখানে আর সুখ নেই।

—এই দশটি টাকা,—এখন নিলে তুমি হারিয়ে ফেলবে না তো?

—না, হারাব না, আপনি দাও।

ব'লে হাত বাড়ালে।

একখানি দশটাকার নোট তার হাতে দিয়ে মহেন্দ্র বললে, তোমার যা ইচ্ছে করে, তাই কিনে খেও।

জড়িত কণ্ঠে গোলক বললে, খাব। ভালো মন্দ জিনিষ এক এক সময় খেতে ভারি মন হয়। তাই খাবো।

ব'লে আর একবার হাত বাড়িয়ে মহেন্দ্রের পায়ের ধুলো নিয়ে নোটখানা হাতের মুঠোয় শক্ত ক'রে ধ'রে উঠে দাঁড়ালো এবং টলতে টলতে নিজের বাড়ীর দিকে চলতে লাগলো।

বাইশ

বাইরে মোটর প্রস্তুত।

মহেন্দ্র এবং পেনিলোপী মাকে প্রণাম করবার জন্যে উপরে গেল। উভয়েরই চিবুকে হাত দিয়ে বিরাজমোহিনী চুমু খেলেন। বললেন, মহিন আবার যখন আসবে মা, তখন তুমিও যেন এসো। কিন্তু এবারে আর একলা নয়; আমার ছেলেকে শুদ্ধ সঙ্গে এনো।

মহেন্দ্র হেসে বললে, এ রকম ভার তো কোনো শাশুড়ী বৌমাকে দেয়নি মা। ছেলেই বৌমাকে সঙ্গে আনে, বৌমা নয়।

সবাই হাসতে লাগলো।

কিন্তু বিরাজমোহিনী ঠকবার পাত্রী নন। বললেন, আমাদের কালে তাই ছিল বাবা। কিন্তু তোদের কালে সবই যে উলটো হয়েছে। এখন বৌমাই ছেলেকে নিয়ে আসে।

খোঁচাটা পেনিলোপী উপভোগ করলে। বুঝলে, মহেন্দ্রের জন্যেই অকারণে এই খোঁচাটা সে খেলে।

বললে, আসব বই কি মা। সামনের ফাল্গুনে মহিনের বিয়ে দিন। সবাই মিলে আনন্দ করা যাবে ক'দিন।

মহেন্দ্রের বিবাহের কথায় বিরাজমোহিনীর মুখে একটা স্নিগ্ধ ছায়া

নামলো। বললেন, তোমরা পাঁচ জন আছ। খুঁজে পেতে ওর একটা ক'নে দেখে দাও। এ তো তোমাদেরই কাজ।

পেনিলোপী হেসে বললে, কিন্তু ছেলেতো আপনার ভালো নয়। ওর ক'নে দেখার ফ্যাসাদ আছে।

সায় দিয়ে বিরাজমোহিনী বললেন, মিথ্যে বলোনি মা। ফ্যাসাদ সত্যিই আছে। ওকে নিয়ে সারাজীবন আমি জ্বললাম। তবে তোমাদের কথা শুনতেও হয়তো পারে।

পুত্রের সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনায় মায়ের গলা ভারি হয়ে এলো।

দোতলায় নামতেই দেখা হ'লো সুবর্ণের সঙ্গে।

সুবর্ণ ওদের আসা বোধ হয় টের পায়নি। গালে একটি পান দিয়ে নেমে যাচ্ছিল। ওদের দেখে মুখের পানটা তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে হাসতে হাসতে কাছে এল। পেনিলোপী বুঝতে পারলে না, কেন পান ফেলে দিলে। কিন্তু মহেন্দ্র বুঝলে।

মহেন্দ্র সুবর্ণের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে। পেনিলোপী নমস্কার ক'রে ওর হাত দুটি জড়িয়ে ধরলে।

বললে, অনেক অত্যাচার ক'রে গেলাম দিদি। চ'লে গেলে যেন গালাগালি দেবেন না।

সুবর্ণ হেসে বললে, গালাগালি দোব না? তাও কি কখনও হয়? তোমার জন্যে যখনই মনটা খারাপ হবে, তখনই গালাগালি দোব। আবার কবে আসছ ব'লে যাও।

—আবার আসব শিগগির। তোমাকে মোটর চালানো শেখাব বলেছি। আসতেই হবে।

মহেন্দ্রের দিকে চেয়ে সুবর্ণ বললে, এবারে তুমি আমাকে অনেক রাগিয়েছ ঠাকুরপো। তোমার শাস্তি তোলা রয়েছে।

হেসে মহেন্দ্র বললে, বেশ খানিকটা উঁচুতে তুলে রেখো বৌদি। কবে

আসব ঠিক তো নেই। আসতে দেরি হতে পারে। আর নাও আসতে পারি। বলা তো যায় না।

সুবর্ণ গম্ভীরভাবে বললে, ও সব বলতে নেই।

কথাটা সুবর্ণ এমনই গম্ভীর ভাবে বললে যে মহেন্দ্র পরিহাস ছলেও আর একটা কথা বলতে পারলে না।

ওরা চ'লে আসবে এমন সময় গায়ত্রী ঘর থেকে বাইরে এসে দূরে থেকেই প্রণাম করলে। পেনিলোপী ছুটে গিয়ে হাত চেপে ধরলে :

—তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে ভাই? কাল বেড়াতে গেলে না। আজও লুকিয়ে ছিলে। কী ব্যাপার তোমার?

গায়ত্রী হাসলে, কোনো উত্তর দিলে না।

মহেন্দ্র নির্বিকার দাঁড়িয়ে ছিল। হাত-ঘড়িটা দেখে বললে, আর সময় নেই পেনিলোপী।

—হ্যাঁ, চল—ব'লে গায়ত্রীর হাতে একটা চাপ দিয়ে পেনিলোপী মহেন্দ্রের পিছু পিছু নেমে গেল।

সত্যই বেশি সময় আর ছিল না। ওরাও ষ্টেশনে পৌছুলো, ট্রেনও এসে পড়লো। নরেন ওদের সঙ্গে ষ্টেশন পর্যন্ত এসেছিল। ওদের ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে, পেনিলোপীকে আবার আসবার জন্যে বার বার অনুরোধ জানিয়ে ট্রেন ছাড়লে পর বাড়ী ফিরলো।

পেনিলোপী ব'সে রইলো জানালায়। দেখতে লাগলো চলন্ত দৃশ্য। মহেন্দ্র একদিকের বেঞ্চে বিছানাটা পেতে নিঃশব্দে শুয়ে পড়লো।

বললে, আমি ঘুমিয়েও যেতে পারি পেনিলোপী। জংশন এলে আমাকে উঠিয়ে যেন চা দিও।

পেনিলোপী বললে, জংশন কেন, যেখানে ইচ্ছা সেখানেই চা খেতে পারো।

—জংশনের আগে আর কোথাও চা পাওয়া যায় না।

—তা জানি মশাই। কিন্তু ওই সবের ভেতর কি আছে জানো?

ব'লে মাথার উপরকার বাক্সের দিকে পেনিলোপী সহাস্তে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে।

—কি ওগুলো?

—খুলে দেখিনি, শুনলাম ফ্লাস্কে চা আছে আর টিফিন-ক্যারিয়ারে খাবার আছে। তোমার দাদার কাণ্ড! আশ্চর্য মানুষ!

তারপর বললে, তোমাকে দেখে বোঝা যেত তোমাদের অবস্থা ভালোই। কিন্তু তোমরা যে এত বড়লোক, তা জানতাম না।

মহেন্দ্র সংশোধন ক'রে দিয়ে বললে, তোমরা মানে আমি নই, দাদা।

পেনিলোপী সবিস্ময়ে বললে, তার মানে?

—মানে বাবা তাঁর সম্পত্তি একা দাদাকেই দিয়ে গেছেন। কিন্তু সে কথা দাদা আমাকে জানতে দিতে চান না।

—কেন?

—সম্ভবত স্নেহবশে। পাছে আমি মনে দুঃখ পাই।

—কেউ কি একথা জানে না?

—সবাই জানে, কিন্তু দাদার মুখে কেউ কখনও শোনে নি। সুতরাং কেউই এ বিষয়ে ঠিক সুনিশ্চিত নয়।

—তবে তুমি জানলে কি ক'রে?

—আমি ওনিশ্চয় ক'রে কিছু জানি না। শুনেছি মাত্র। কিন্তু দাদার কাছে যাচাই করার চেষ্টা করিনি। তবে আমার বিশ্বাস কথাটা মিথ্যা নয়।

—সুবর্ণ জানে না?

—বোধ হয় না।

—তুমি বলতে চাও, তোমার দাদা নিজের স্ত্রীর কাছেও এ কথা গোপন করেছেন।

—দাদা তা পারেন।

একটু থেমে পেনিলোপী বললে, গুজবও তো হ'তে পারে।

—তাও পারে, কিন্তু তা নয়। আমাকে দেখলেই মায়ের মুখ ম্লান হয়ে যায়। সন্দেহ হয়, এক মাত্র তিনিই হয়তো ব্যাপারটা জানেন এবং জেনে খুব অশান্তি ভোগ করছেন।

—কিন্তু তোমার বাবার এরকম করার কোনো কারণ আছে?

—আছে, এবং অত্যন্ত সঙ্গত কারণই আছে। সত্যি কথা বলতে কি এর জন্যে বাবা, দাদা অথবা অন্য কারও উপর আমার কোনো রাগ নেই।

—কি তোমার অপরাধ?

—অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর। আমি ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও আচারভ্রষ্ট। আমি কালাপানি পার হয়েছি, জাত মানি না, উপবীত ত্যাগ করেছি।

—এ আর আজকাল এমন কী গুরুতর অপরাধ!

—কিছুই নয়। কিন্তু আমার বাবাকে আমি ভালো ক'রেই জানি। তাঁর কাছে এর চেয়ে গুরুতর অপরাধ আর নেই। এবং সম্পত্তিটা যখন তাঁর, তখন এবিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত নয় কি?

মহেন্দ্র হাসতে লাগলো।

তারপর বললে. উত্তর আফ্রিকা গেলে, কিংবা মুসলমানের হাতে মুর্গির মাংস খেলে জাতিচ্যুত করবে সমাজের এমন আঁটাআঁটি বাংলা দেশে খুব কম জায়গাতেই তুমি পাবে। কিন্তু আমাদের এইদিকটা ব্রাহ্মণপ্রধান। বহু পণ্ডিতের বাস এখানে। তার উপর আমাদের বংশের মতো একটি অত্যন্ত গোঁড়া এবং নিষ্ঠাবান বংশের হাতে জমিদারী থাকায়, এই দিকটা এখনও উনবিংশ শতাব্দীর আওতা ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। এত গোঁড়ামি তুমি আর কোথাও পাবে না।

দুজনেই নিঃশব্দে বসে রইল।

ট্রেন ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পার হয়ে যায়। মহেন্দ্র পাশ ফিরে শুয়ে। সম্ভবত ঘুমুচ্ছে। পেনিলোপী জানালার বাইরে চেয়ে পল্লীবাংলাকে দেখছে। তার গরু-চরা মাঠ, পদ্ম-ফোটা পুকুর, পানাবোঝাই খাল।

হঠাৎ এক সময় ডাক শুনলে, পেনিলোপী!

চমকে মুখ ফিরিয়ে পেনিলোপী জিজ্ঞাসা করলে, ঘুম ভাঙলো?

—ঘুমোইনি তো।

সবিস্ময়ে পেনিলোপী বললে, জেগে জেগেই এতক্ষণ মুখ বুজে পড়ে ছিলে? আশ্চর্য!

মহেন্দ্র বললে, চিরজীবনই তো তাই রইলাম পেনিলোপী। ওইটুকুই তো আমার অহঙ্কার।

—ডাকছিলে কি জন্যে?

—দেখ তো খাবার-টাবার কি কি আছে? ক্ষিধেও পেয়েছে, বিশেষ একটু চা নইলেই নয়।

টিফিন-ক্যারিয়ার খুলে পেনিলোপী অবাক! লুচি, চপ, কাটলেট, মাছের ফ্রাই, আলুর দম থেকে বড় বড় রসগোল্লা এবং নতুন গুড়ের সন্দেশ পর্যন্ত সবই আছে। আর তাও এত বেশি পরিমাণে যে বলবার নয়।

পেনিলোপী সভয়ে বললে, এ বোধ হয় আমাদের জন্যে নয়।

—তার মানে?

ঘাড় নেড়ে পেনিলোপী সজোরে বললে, আমাদের জন্যে কখনই নয়। এতে যা আছে তাতে আমাদের কলকাতার গোটা পাড়ার লোককে খাওয়ানো যায়।

মহেন্দ্র উঠে বসে বললে, ঠিকই হয়েছে। আমার দাদার ব্যবস্থাই ওই রকম। ও রকম না হলেই সন্দেহের কারণ ঘটতো। আমার কেবল আশঙ্কা হচ্ছে, এই অবেলায় দাদাকে গিয়ে আবার স্নান করতে হবে। অথচ শরীর তাঁর ভালো নয়।

—স্নান করতে হবে কেন ?

—কারণ ইব্রাহিমের রান্না ঐ অখাদ্যগুলো যে-মোটরে এসেছে, সেই মোটরে তিনি নিজেও এসেছিলেন।

—এগুলো মোটরে তো আসেনি। ইব্রাহিম হাতে ক'রে নিয়ে ছিল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মহেন্দ্র বললে, বাঁচা গেল। এই অবেলায় স্নান করে দাদা যদি বা বাঁচতেন, মোটরখানা বাঁচতো না।

—মোটরটাকেও স্নান করাতেন না কি ?

—তা ছাড়া উপায় ছিল না। মুর্গির কাটলেট ও-মোটরে এলে ওকে স্নান করতেই হত। তা সে যাক গে, কি আছে ছাই-ভস্ম বের করো। যতদূর পারি ওগুলো খেয়ে নিঃশেষ করে দিই। অবশিষ্ট রেখে দাও, বসন্তকে দেওয়া যাবে।

—সেই ভালো। ব'লে পেনিলোপী দু'টো প্লেটে দুজনের খাবার সাজিয়ে ফেললে।

খেতে খেতে মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, বসন্তর জন্যে তোমার মন-কেমন করছে না পেনিলোপী ?

—করছে বই কি ! যা অগোছালো মানুষ, বাড়ীঘর হয়তো নরককুণ্ড ক'রে রেখেছে !

মহেন্দ্র যোগ দিলে : হয়তো কোনো দিন খাওয়াই হয়নি, জামা-কাপড় ময়লা, যে মোজাগুলো শেলাই করে দিয়ে এসেছিলে, সেগুলো আবার ছিঁড়েছে, ফুলগাছগুলোয় জল দেওয়া হয়নি, টেবিলে ধূলো জমেছে আধ ইঞ্চি।—বুঝতে পারছি খুব মন-কেমন করছে ! আর একটু চা দিতে পার পেনিলোপী ?

পেনিলোপী রেগে বললে, না পারি না। ওই ফ্লাস্কটায় আছে, ইচ্ছে হয় ঢেলে নাও।

তেইশ

পেনিলোপী প্রেমের সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দিচ্ছিল :

বাপ-মা গাঁই-গোত্র মিলিয়ে একটা কনে দেখে দিলে, ছেলে চোখ-কান বুজে বিয়ে ক'রে ফেললে, তারপর বাড়ীর আরও পাঁচজনের সঙ্গে তারাও খাটে-খোটে, কাজ করে, ছেলে-পুলে হয়,—আমাদের দেশে বিবাহিত-জীবন এমন নিস্তরঙ্গ নয়।

মহেন্দ্র বললে, তাতে তরঙ্গটা কি?

—আছে। মনের মানুষকে আমাদের খুঁজে নিতে হয়।

—কিন্তু খুঁজে নেওয়ার পরে তো, আমাদেরও যে-অবস্থা তোমাদেরও সেই-অবস্থা?

পেনিলোপী হেসে বললে, সম্ভবত। কিন্তু ওই খুঁজে নেওয়াটাই একটা মস্ত ব্যাপার। তোমাদের কাছে বড় হ'ল দেহের শুচিতা, আমাদের কাছে বড় হ'ল প্রেম।

—দেহের শুচিতার মানে বুঝি। কিন্তু প্রেম বস্তুটা কি?

—সে মুখে বলবার নয়, অনুভব করবার। সহস্র লোকের মধ্যে একটি লোককে দেখলে চোখমুখ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, বুকের মধ্যে জ্বলে ওঠে আগুন, —সেই হ'ল প্রেম। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি! তেমন হয় তোমাদের?

—বোধ হয় না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক আমরা, আগুনের দরকার কম।

এ পরিহাস পেনিলোপী গায়েও মাখলে না। দীপ্ত কণ্ঠে ব'লে চললো :

—সেই প্রেম, যার প্রেরণায় মানুষ অবহেলায় পাহাড় পার হয়, সাগর

ভিজিয়ে যায়, কোনো বাধাকেই বাধা ব'লে মনে করে না। তোমার গায়ত্রী খুব ভালো মেয়ে, তোমাদের শাস্ত্রমতে যাকে সতী বলে তাই। সে অশেষ দুঃখ কষ্ট অবহেলায় স্বীকার করবে, তবু দেহের শুচিতার বিনিময়ে তোমার ঘরে রাজরাণী হয়ে আসতেও প্রস্তুত নয়। এমন মেয়ে আমাদের সমাজে তুমি পাবে না। কিন্তু প্রেমের জন্যে ঐশ্বর্যশালী স্বামীকে ছেড়ে ভিক্ষুকের কুটিরে এল, এমন মেয়ে আমি নিজেই দেখেছি।

বসন্ত এক কোণে চোখ বুজে বসে চুরুট টানছিল। এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। এখন বললে, গায়ত্রীর ওটা শুধু দেহের শুচিতা নাও হতে পারে। হয়তো সংস্কার।

পেনিলোপী চমকে গেল। বিচিত্র নয়, সংস্কারও হতে পারে। সংস্কারের শক্তিও সামান্য নয়।

মহেন্দ্রের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার কি মনে হয়?

নিস্পৃহভাবে মহেন্দ্র বললে, কিছুই মনে হয় না। শোনো, সিনেমায় যাবে? একটা ফিল্ম এসেছে The Lily of the Lake.' শুনছি নাকি অদ্ভুত হয়েছে। যাবে?

পেনিলোপীর মন উসখুস করে ক'রে উঠলো। বললে, এখন কটা বাজে? ভালো ফিল্ম হলে আর কি টিকিট পাওয়া যাবে?

—দেখতে পারি টেলিফোন ক'রে, অবশ্য যদি যাও।

বসন্তর দিকে চেয়ে পেনিলোপী জিজ্ঞাসা করলে, যাবে?

বসন্ত স্রেফ ঘাড় নাড়লে। বললে, না। আমি যা ঘুরেছি, এই সোফাটা ছেড়ে এক পাও আর নড়ছি না।

—তাহ'লে আজ থাক মহিন। কাল যাওয়া যাবে বরং। কিন্তু এখানে তোমরা সন্ধ্যাটা কাটাও কি করে? না ক্লাব, না কিছু। কি ক'রে কাটাও?

মহেন্দ্র বললে, ভূতের গল্প ব'লে।

ওরা হাসতে লাগলো।

মহেন্দ্র বললে, তোমাদের অসুবিধাটা আমি বুঝতে পারিছি। পেনলোপী, 'Two is company, three is none.' তোমরা একটু বিশ্রাম কর। কিংবা ভূতের গল্প ও করতে পার। আমার কতকগুলো জরুরী চিঠি এসেছে, তার উত্তর আজ দিতেই হবে। আমি চললাম, আবার কাল সকালে দেখা হবে।

কেউ বাধা দেবার পূর্বেই মহেন্দ্র নিচে নেমে গেল।

অনেকগুলো জরুরী চিঠি এসে জমেছে সত্য। মহেন্দ্র সেগুলোর জবাব লেখবার জন্যে বসলো।

এবারে দেশ থেকে ফেরবার পর থেকে বাড়ীর চিঠি আসাটা অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে। স্বর্ণ মহেন্দ্রকে কালে-ভদ্রে চিঠি দিত। এবারে সত্যন্ত ঘন ঘন দিচ্ছে,—মহেন্দ্রকেও, পেনিলোপীকেও। গায়ত্রীও চিঠি দিচ্ছে পেনিলোপীকে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি স্বর্ণর চিঠির জবাব দেওয়া মহেন্দ্রের পক্ষে অসম্ভব। চিঠি লেখার বিষয়ে সে আবাল্য অলস স্বর্ণর চিঠিখানি সে একপাশে সরিয়ে রেখে দিলে। তুলে নিলে নরেনের চিঠিটা।

চিঠিটা জরুরী। এর একটা উত্তর আজকেই দিতে হয়।

কিন্তু কি উত্তর দেবে ?

বিরাজমোহিনী আর দেশে থাকতে চান না, কাশী যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। শেষ বয়সটা সেইখানেই যদি তিনি কাটাতে চান, স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারেন। তার জন্যে মহেন্দ্রের অনুমতির অপেক্ষা করে না। কিন্তু সঙ্গে কে থাকবে ? দাদা লিখেছেন; গায়ত্রীর খুব ইচ্ছা সে সঙ্গে যায়। সে গেলে মায়ের যত্ন হবে। তবে আর কি ? পাঠিয়ে দিন তাদের। না, তাও হবে না। নরেনের বিশ্বাস, তাকে ছেড়ে মা একদিনও কোথাও থাকতে পারবে

না। তাহ'লে কাশী পাঠিয়ে কাজ কি? দাদা নিজের কাছেই মাকে রেখে দিতে পারেন। কিন্তু মা থাকতে কিছুতেই রাজি নন। তাহ'লে আর কি করা যায়? সে চিঠিখানাও মহেন্দ্র তখনকার মতো সরিয়ে রেখে দিলে।

মহেন্দ্র ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলো। কিছুই যেন ভালো লাগছে না তার। এবারে দেশ থেকে এসে পর্যন্তই তার এই অবস্থা। কাজে মন বসে না।

একবার মনে হ'ল, নরেনকে লিখে দেয়, মাকে কাশীই পাঠিয়ে দেওয়া হোক। মহেন্দ্র নিজেই থাকবে মায়ের কাছে। ধর্মে তার মতি নেই সত্য, জননী জাহ্নবীর মহিমাও হয়তো উপলব্ধি করতে পারে না। তবু সমস্ত কিছু থেকে দূরে, সমস্ত কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেশ কাটিয়ে দেবে বাকী জীবনটা।

কিন্তু জানে তা সম্ভব নয়। তার মতো অনাচারীর সঙ্গে এক বাড়ীতে থাকতে হবে জানলে বিরাজমোহিনী কাশী কেন, বৈকুণ্ঠে যেতেও রাজি হবেন না।

সংসারের সঙ্গে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের আচরণে এই সম্পর্ক সে গ'ড়ে তুলেছে।

পায়চারী করতে করতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে দূরের দিকে একদৃষ্টে সে চেয়ে রইলো। যেন তার সামনের সুদীর্ঘ পথটাকে সে দেখতে চায়। সুদীর্ঘ পথ। এঁকে-বেঁকে দিগন্তের কোলে গিয়ে অদৃশ্য হয়েছে। কল্পনার দৃষ্টিতে পথের দুধারে কোথাও এতটুকু ছায়াও সে দেখতে পেলে না। চারিদিক শুধু ধূ-ধূ করছে!

এই পথ পার হয়ে যেতে হবে তাকে!

কিন্তু কোথায়?

কোথায় তা কেউ জানে না। তবু যায়, তবু যেতে হয়। মহাকালের আহ্বান অমোঘ, তাকে উপেক্ষা করার উপায় নেই।

এমন সময় একখানা ফাইল হাতে বসন্ত এলো।

বললে, শোনো। এই যন্ত্রপাতিগুলোর অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। আজ চিঠি এসেছে এগুলো তৈরি। কাল-পরশু নিয়ে আসি, কি বল? কিন্তু রাখি কোথায়? ঘরটা ভাড়া নেওয়ার লেখাপড়া করতেই তো এত সময় কেটে গেল। এখন ওটাকে ডিস্টেম্পার করতে হবে। ফার্নিচার এনে সাজাতে হবে। তোমার ও দিশী মিস্ত্রীর কাজ নয় হে! আমি চীনে-মিস্ত্রীকে খবর দেব ভাবছি। তারপরে,

মহেন্দ্র অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনছিল, এই বার হাত জোড় করলে। বললে, তারপরে আর নয় ভাই। আমাকে এইবার রেহাই দাও।

বিস্মিতভাবে বসন্ত বললে, তার মানে?

—তার মানে আমার আর ভালো লাগছে না। আর আমি পারছি না। কোন একটা কাজে অধ্যবসায়ের সঙ্গে লেগে থাকবার শক্তি আমি হারিয়েছি।

বসন্ত যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে, কি আবোল-তাবোল বকছ তুমি!

মহেন্দ্র বসন্তকে নিয়ে পাশের একটা সোফায় বসলো। এবং বলতে লাগলো:

—তোমাকে সব কথাই বলি বসন্ত। ক্লিনিক খোলায় আমি আর উৎসাহ পাচ্ছি না। আমি ওর মধ্যে রইলাম, কিন্তু আমার উপর নির্ভর কোরো না। তুমিই যা হয় কোরো। মাঝে মাঝে আমি আসব, যতটুকু পারি তোমার সাহায্য করব, তারপর আবার যখন ভালো লাগবে না, তখন চলে যাব।

—কি করবে তুমি?

—কিছুই করব না। তুমি বুঝতে পারছ না বসন্ত, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, আমার কিছুই করার শক্তি নেই। আমার উপর নির্ভর করা ব্যবসার পক্ষে নিরাপদও হবে না।

—তাহ'লে একেবারে কিছুই করবে না তুমি ?

—না। একেবারে চুপচাপ থাকতেও বোধ হয় পারব না। কিছু কিছু করতে হবে, এলোমেলো ভাবে। যেমন ধর, দেশের কাজ, বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ,—ডাক এলে দুর্গতদের সেবার জন্যে যেখানে দরকার যাব, যতখানি পারব করব। যখন পারব না এইখানটিতে এসে লুকিয়ে পড়ব। নয় তো বাইরে কোথাও ঘুরে ঘুরে বেড়াব।

—আচ্ছা, তাই হবে।—বলে বসন্ত হাসলে। বললে,—আজ মনটা তোমার, যে কারণেই হোক, ভালো নেই। আমি চললাম। তুমিও বরং একটু ঘুমুবার চেষ্টা করগে।

মহেন্দ্রের পিঠে দুটো চাপড় দিয়ে বসন্ত শিস্ দিতে দিতে উপরে চলে গেল।

এরই দিনকয়েক পরে।

সন্ধ্যাবেলায় মহেন্দ্র লেপ মুড়ি দিয়ে খাটে শুয়ে ছিল। এমন সে করত না। শোয়া দূরে থাক, এক জায়গায় দীর্ঘকাল বসে থাকাই তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কোনো কাজ না থাকলে ব'সে কিংবা শুয়ে থাকার চেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোই সে পছন্দ করত। কিন্তু ক'দিন থেকে কি যে তার হয়েছে, শুয়েই সে বেশিক্ষণ থাকে। ঘুমায় না, ঘুমনো সম্ভবও নয়, শুধু আকণ্ঠ লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে থাকে।

সেদিনও তাই ছিল। ঘরে জ্বলছিলো শুধু নীল বেড-লাইটটা। অন্য লাইটটা তার চোখে লাগে।

এমন সময় পেনিলোপী এলো ধীরে ধীরে।

—আমাকে তোমার ঘরে একটু আশ্রয় দেবে মহিন ?

মহেন্দ্র খাটের উপর উঠে বসলো। সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলে, কি

ব্যাপার! তুমিই হলে আমাদের আশ্রয়দাত্রী! আর তুমিই বেরুলে আশ্রয়ের খোঁজে! 'ভিখারিণী হল আজি কমল-আসনা!' ব্যাপারটা কি পেনিলোপী? বসন্ত তাড়িয়ে দিলে বুঝি?

ভুরু বেঁকিয়ে, চোখ টেনে, ঠোঁট কুঁচকে পেনিলোপী ফোঁস করে উঠলো। বললে, ইস্, আমাকে কি বাঙালীর ঘরের মেয়ে পেয়েছ যে, কখনও মাথায় রাখবে, কখনও পায়ে থেঁৎলাবে?

মহেন্দ্র হেসে বললে, তা'হলে তুমি বাঙালী মেয়েদের কিছুই চেননি। তারা বাইরে যেমন অবলা, ভিতরে তেমন সবলা।

পেনিলোপী হেসে বললে, ও কথা আমাকে আর বোলো না, আমি দেখে এসেছি সব।

—কিছুই দেখে আসনি। এই বাড়ীতে মাস দুই আগে এলে দেখতে পেতে বাঙালী মেয়ের প্রতাপ।

—কি রকম?

পাশের একটা বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে মহেন্দ্র বললে, ওই যে বাড়ীটা দেখছ না, মাস দুই আগে পর্যন্ত ও বাড়ীতে একটি পরিবার ছিল। গৃহিনীটির যেমন দশাসই কলেবর, তেমনি কণ্ঠ! কী একটা কাজ করত বোধ হয়। সকালে চুল বেঁধে, কুঁচিয়ে কাপড় প'রে, বেঁটে ছাতাটি হাতে ক'রে কোথায় বেরিয়ে যেত। ফিরতো কোনোদিন সূর্য ডোববার আগেই, কোনোদিন সন্ধ্যার পরে, এক একদিন রাত এগারোটাও হ'ত। এলেই পাড়ার লোক বুঝতে পারতো, তিনি এলেন। দেখতাম, চক্ষুর পলকে স্বামী থেকে আরম্ভ ক'রে ছেলে মেয়ে পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠতো। বোধ করি মেয়েটার একটু শুচিবাই ছিল। রবিবার কিংবা ছুটির দিন হ'লে ঘর ধোয়ার পালা প'ড়ে যেতো। মহিলাটি নিজেই একখানা গামছা প'রে ঝাড়ু হাতে লেগে যেতেন ঘর পরিষ্কার করতে। আর একটা গামছা প'রে কর্তা জল তুলতেন, বিছানা-পত্তর রোদে

দিতেন। সমস্ত দিনের মধ্যে ভদ্রলোক আর কাপড় পরবার সুযোগ পেতেন না।

—কেন?

—ঠিক জানি না। বোধ হয় ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়ে। শনিবারেও দেখতাম অফিস থেকে ফিরে সারা বিকেল ভদ্রলোক একটা গামছা পরেই ছাদে ঘুরে বেড়াতেন। আর সব সময় যেন চোর। এত কাছে থেকেও কোনো দিন তাঁর গলা শুনি নি। দেখনি তো সে মেয়েকে?

—একরম জাঁদরেল মেয়ে সব দেশেই আছে মহিন।

—নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু বাংলা দেশেও যে আছে, এতো তুমি ভাবোনি পেনিলোপী। গৃহিনীরা সব দেশেই মোটামুটি এক,—কখনও নরম কখনও গরম। স্বামীরাও সব দেশেই পারতপক্ষে গৃহিনীদের ঘাঁটায় না। তাতে সংসারে অশান্তি বাড়ে। কে সহজে অশান্তি বাড়ায় বল? অশান্তিকে কে ভয় করে না?

—তা ঠিক।

—তবে হ্যাঁ। সুদিন ছিলো আগে।

—কি রকম?

—এই আমরা, জানো তো আমরা কুলীন ব্রাহ্মণ?

—না, জানি না। তবে স্বীকার করছি।

মহেন্দ্র বললে, আমরা কুলীন ব্রাহ্মণ। আগে আমরা ইচ্ছে করলে তিনশো পঁয়ষট্টিটাও বিয়ে করতে পারতাম।

—সে আবার কি!

—হ্যাঁ, পারতাম। কল্পনা কর সে কী আনন্দ! তিনশো পঁয়ষট্টিটি শ্বশুরালয়ে বিভিন্ন বয়সের তিনশো পঁয়ষট্টিটি গৃহিনী; বছরের তিনশো পঁয়ষট্টিটি দিন আমারই প্রতীক্ষায় রয়েছেন। আমি একটি ক'রে দিন একটি ক'রে শ্বশুরালয়ে অতিবাহিত করি। খাই-দাই-রাত্রিবাস করি,

এবং প্রভাতে দক্ষিণাস্তে অন্য শ্বশুরালয়ের দিকে যাত্রা করি। ভাবো তো কী অবাধ মুক্তি! আমার বাড়ীঘর করার দরকার নেই, ঝি-চাকর, বাবুর্চি-বেয়ারার দরকার নেই। সমস্ত জীবন শুধু এক শ্বশুরবাড়ী থেকে আর শ্বশুরবাড়ী যাওয়া!

—কি হ'ল তার?

—উঠে গেল! পশ্চিম থেকে তোমরা এলে আমাদের সভ্য করতে। এসে শুধু আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতাই কেড়ে নিলে না, বৈবাহিক আনন্দ থেকেও বঞ্চিত করলে।

—কিন্তু সেই মেয়েগুলির কি হ'ত ভেবেছ?

—ভাববার তো দরকার নেই পেনিলোপী। নিজের চেয়ে বড় সংসারে কিছুই নয়। আমরা কি হারালাম সেইটেই ভাবি, আর দীর্ঘশ্বাস ফেলি।

ব'লে মহেন্দ্র সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

চব্বিশ

চৈত্রমাসের শেষের দিকে পেনিলোপীর পত্রে স্থবর্ণ জানতে পারলে, মহেন্দ্র কলকাতায় নেই। মাস দুয়েক হ'ল সে বেড়াতে বেরিয়েছে। বলে গেছে কাশী, এলাহাবাদ, দিল্লী, লাহোর এবং সেখান থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত যাবে। ফিরতে আষাঢ়ের শেষ।

পেনিলোপী আরও জানিয়েছে, কাশী পৌছে যে একখানা চিঠি সে দিয়েছিল, তার পরে তার আর কোনো খবরই পাওয়া যায় নি। স্থবর্ণ যদি কোনো চিঠি পেয়ে থাকে, যেন জানায়। ওরা সবাই মহেন্দ্রের জন্তে খুব ভাবছে।

চিঠি পাওয়া দূরে থাক্, মহেন্দ্র যে কলকাতায় নেই, পেনিলোপী না জানালে এ খবরটাও তারা জানতে পারত না। মহেন্দ্র তাদের কোনো চিঠিই দেয়নি। কাশী থেকেও না, দিল্লী-লাহোর কোথাও থেকেই না। সে যে ক'লকাতার বাইরে যাচ্ছে এ খবরটাও সে জানায় নি।

সুবর্ণ মহা মুস্কিলে পড়লো।

তখন বিকেলবেলা। নরেন বাইরে অফিসের কাজে ব্যস্ত। কিন্তু তখনই সুবর্ণ তাকে ডাকতে পাঠালো।

ডাকাডাকির রোগ সুবর্ণর নেই। সুতরাং নরেন খুব চিন্তিতভাবে তখনই চলে এল।

—কি ব্যাপার?

—ঠাকুরপোর কোনো খবর পেয়েছ?

নরেনের মাথাটা যেন ঘুরে গেল। বললে, না। কোনো খবর আছে নাকি?

স্বামীর অবস্থা দেখে সুবর্ণ তাড়াতাড়ি বললে, না। খারাপ কিছু নয়। কোনো খবর পেয়েছ কি না জানতে চাইলাম, তা এমন করলে! তুমি যেন মেয়েমানুষেরও অধম। যেন মহিনের বিধবা দিদি!

সুবর্ণর হাসি দেখে নরেনও আশ্বস্ত ভাবে হাসলে।

বললে, বিধবা দিদিতেই কি কেবল ভালোবাসতে জানে বড় বৌ, দাদাতে জানে না?

—কিন্তু কোন্ পুরুষ-মানুষে এমন স্ত্রীলোকের মতো ব্যস্ত হয়?

একথার আর নরেন জবাব দিলে না।

বললে, তার একখানা চিঠি পেয়েছি। আগ্রা থেকে লিখেছে। কিছুদিন আগ্রায় থেকে লাহোর যাবে। সেখান থেকে পেশোয়ার। ভায়া এবার লম্বা টুরে বেরিয়েছেন।

নরেন হাসলে।

বললে, শ পাঁচেক টাকা পাঠাতে লিখেছিল। কিন্তু সেই সময়টা ক্লার্টের্স ঝামেলা। একশো টাকার বেশি তখন পাঠাতে পারি নি। দু'তিন দিন হোল বাকি চারশো পাঠিয়েছি।

সুবর্ণ পেনিলোপীর চিঠির বৃত্তান্ত জানালে।

বললে, চিঠি না পেয়ে ওরা ভয়ানক ভাবছে। কিন্তু হঠাৎ বাবুর বেড়াবার সখ হ'ল কেন, এই গরমে?

—কি ক'রে বলব বল।

—লেখেনি কিছু ?

—না। তবে ও তো চিরকালই খেয়ালী। এমনি খেয়ালেই একদিন যুদ্ধে চলে গিয়েছিল, এমনি খেয়ালেই আজ শফরে বেরিয়েছে।

—কবে ফিরবে, কিছু লিখেছে ?

—না। আমিও জানতে চাইনি। কি দরকার বল ? আমার অনুমতি নিয়ে তো বেরোয়নি।

সুবর্ণ বললে, তুমি টাকা পাঠালে কেন? না পাঠালে হয় তো তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে বাধ্য হ'ত।

নরেন হাসলে। বললে, তুমি তাহ'লে তাকে কিছুই চেনো বড় বৌ। তাকে কোনো কাজ করতে বাধ্য করাতে পারে এমন শক্তি পৃথিবীতে কারও আছে বলে আমি জানি না।

ব্যঙ্গভরে সুবর্ণ বললে, তোমারও না? তুমি তো বল তোমাকে সে খুব ভক্তি করে।

—সেটাও মিথ্যে নয়। তুমি বিধবা দিদি বলে যে ঠাট্টা করলে, সেও সত্যি। ওর ছেলেবেলায় মা বারো মাস ভুগতেন। ওকে কখনও দেখাশুনো করতে পারেন নি। আমাদের দিদি ছিল না, বোন ছিল না। আমিই ওকে দিদির মতো করে মানুষ করেছি। বাবা ওকে দেখতে পারতেন না। মহিনও কখনও বাবার কাছে যেত

না। ওর যত কিছু আব্দার, যত কিছু বায়না আমারই কাছে ক'রে এসেছে।

—তার প্রতিফল ভালোই পাচ্ছ!

—তা পাচ্ছি। সেই জন্যেই তো নিজের ছেলেগুলোকে দেখি না। ওরাও তো ঐ রকমই হবে।

বলে নরেন আর সেখানে দাঁড়ালো না। সোজা তেতলায় মায়ের ঘরে চলে গেল।

উপরের ঘরে বিরাজমোহিনী একখানি কম্বলের উপর ব'সে মালা জপ করছিলেন। হাতে কাজ না থাকলে এইটেই তাঁর কাজ।

ঘরে আর কাকেও না দেখে নরেন ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে মায়ের কাছে এসে বসলো।

বিরাজ মোহিনী জিজ্ঞাসা করলেন, দরজা বন্ধ করে দিলি যে! আমাকে গোপনে কিছু বলবি!

—তোমার নামে যে মাহালটা কেনা হয়েছে, সেইটের কথা বলতে এসেছিলাম মা।

—কেন, সেটার কী হয়েছে?

—হয়নি কিছুই। বলছিলাম, বাবা তো ছোঁড়াকে কিছুই দিয়ে যান নি। বাবার সর্ত ও ভেঙেছে। সেই সর্তের অমর্যাদা আমি কিছুতেই ত পারব না। তাতে বাবা স্বর্গে বসেও ক্ষুন্ন হবেন। সে আমি পারব না। কিন্তু যে রকম দেখছি, ও কিছুই করবে না. করতে পারবেও না। শুধু উড়ে-উড়ে বেড়াবে। এ অবস্থায় কী করা যায় ওর জন্যে?

—কি করতে চাও তুমি?

—আমি বলি কি, তোমার নামের এই মাহালটা ওকেই উইল করে দাও। আর সে বিষয়ে দেরী করা ঠিক হবে না। জীবন-মৃত্যুর কথা তো কেউ বলতে পারে না!

বিরাজমোহিনী হেসে বললেন, ওরে বিধবার পরমায়ু হাজার বছর। সেজন্যে ভাবিস নি। কিন্তু আমার কাছে লুকোনো তো মিথ্যে নরেন, যেন মহিনও একেবারে ফাঁকি না পড়ে সেই জন্যেই তো ও মাহাল তুই আমার নামেই নীলেম কিনেছিলি। এখন যদি ওকেই ওটা দিতে চাস, আমি বাধা দোব কেন?

খুশি হয়ে নরেন বললে, বাধা যে তুমি দেবে না, সে আমি জানি মা! সেজন্যে আমার কোনো দুশ্চিন্তাও নেই। কিন্তু আজকে বিশেষ করে সেই কথাটা তুলতে এসেছি অন্য কারণে।

—কি কারণে?

—মহিনের মতিগতি আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এখান থেকে যাবার সময় বলে গেল, ক'লকাতায় গিয়ে ডাক্তারী করবে। তার বন্দোবস্ত করেছে, সে খবরও পেলাম। এর মধ্যে হঠাৎ এমন কি ঘটলো যে, সে পালিয়ে গেল?

—কোথায় পালিয়ে গেল?

—গিয়েছিল কাশী, সেখান থেকে দিল্লী, এখন রয়েছে আগ্রায়, সেখান থেকে যাবে লাহোর, তারপর পেশোয়ার পর্যন্ত। এরকম করার তো মানে খুঁজে পাচ্ছি না।

—ও তো নরেন, চিরকালই অমনি। চিরদিনই জালিয়েছে, এখনও জালাচ্ছে, যতদিন বাঁচবে ততদিন জালাবেও। তার জন্যে তোর তৈরী থাকাই ভালো।

নরেন চিন্তিত ভাবে বললে, এ তো ঠিক তা নয় মা। আমার সন্দেহ হয়, বাবা যে ওকে ত্যাজ্যপুত্র করে গেছেন, এখবরটা এখন ও কোনো রকমে জেনেছে। হিতৈষীর তো অভাব নেই! অবশ্য সঠিক খবর গ্রামের লোক কেউ জানে না। শুধু একটা গুজব রটেছে।

বিরাজমোহিনী বললেন, কিন্তু যে খবরটা দু'দিন পরে ও জানতে

পারবেই. তাই নিয়ে এত ঢাকাঢাকি যে তুই কেন করিস, আমি

নরেন শিউরে উঠে বললে, খবরটা ও শুনবে, মুখ ওর ফ্যাকাশে 'হয়ে' যাবে, তাই আমি দেখব, এ তুমি ভাবতে পারো মা? ওকে হারানোর চেয়ে বড় সর্বনাশ আমার আর আছে? যাই হোক, তোমার উইলটা আমি তাহ'লে উকিলকে তৈরি করতে বলি। সাক্ষী থাকব আমি নিজে আর বাইরের ক'জন বন্ধু। কি বল?

বিরাজমোহিনী বললেন, এ বিষয়ে আমার মতামত আর কি বাবা, তুমি যা ভালো বুঝবে করবে।

ব'লে বিরাজমোহিনী হাসলেন। নরেনও খুশি হয়ে নিচে নেমে গেল।

তার পরের দিন সন্ধ্যা বেলায়।

সূর্য ডোববার আগেই ভাঁড়ার বের ক'রে দিয়ে স্বর্ণ উপরে ওঠে। কচি-কাচা নিয়ে আর নামতে পারে না। গায়ত্রী একাই রান্না করে।

সেদিনও তাই করছিল। আর ফ্যালার মা বাইরে ব'সে যত রাজ্যের গল্প করছিল। গল্পের ভাণ্ডার ফ্যালার মায়ের অফুরন্ত। বয়স হয়েছে ষাট বচ্ছর। এই ষাট বচ্ছরের যত পুরাতন কথা তার মনে পড়ে যায়, তা শোনবার ধৈর্য গায়ত্রী ছাড়া এ বাড়ীতে আর কারও নেই।

গায়ত্রীও কতক শোনে, কতক শোনে না। কিন্তু তালে তালে হুঁ-টা ঠিক দিয়ে যায়। ফ্যালার মায়ের তাতেই কাজ চ'লে যায়। বুড়ো বয়সে বকুনীটা স্বভাবতই বাড়ে। তারও বেড়েছে। এমন অবস্থায় একটা ঘুমন্ত লোকের কাছে বকতেও তার আপত্তি নেই।

ন'বছরে তার বিয়ে হয়েছিল। স্বামী যে কি, তাই তখন সে জানতো না। সেই বয়সে ননদ আর শাশুড়ীতে মিলে কী অত্যাচারটা তার উপর

করতো, চৈত্রের সন্ধ্যায় তাই সেদিন তার মনে পড়ে গেল। এবং গায়ত্রীর কাছে রান্নাঘরের বাইরের বারান্দায় সেই বিবরণ খুলে বললো।

করুণ কাহিনী সন্দেহ নেই। ফ্যালার মা যত বলে, তার দ্বিগুণ কাঁদে। হঠাৎ একসময় তার গল্পের সুর গেল কেটে।

চীৎকার ক'রে উঠলো:

—কী হ'লো গো! এ আবার কী হ'ল গো! ওগো, কে কোথায় আছ গো! গায়ত্রী, ও গায়ত্রী!

ফ্যালার মায়ের কণ্ঠস্বরের খ্যাতি আছে বরাবরই। সুতরাং বাড়ীর ভিতরে ঝি-চাকর যারা ছিল তারা তো বটেই, বাইরে থেকে আমলা-কর্মচারী এবং উপর থেকে সুবর্ণ পর্যন্ত ছুটে নেমে এল।

—কি হয়েছে! কি হয়েছে!

ফ্যালার মা চ্যাচাতে লাগলো:

—ওগো, গায়ত্রীর কী হয়েছে দেখ গো! এই তো দিব্যি রাঁধছিল, গল্প করছিল, হঠাৎ অমন করছে কেন গো!

সিঁড়িতে সুবর্ণকে দেখেই আমলারা বারান্দা থেকে নেমে পথ ছেড়ে দিলে। আড়-ঘোমটা টেনে সুবর্ণ রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লো। গায়ত্রীর মাথাটা কোলে নিয়ে মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললে, তুই শিগগির একটা পাখা নিয়ে আয় ফ্যালার মা। আর ওঁদের স'রে যেতে বল। এমন কিছুই হয়নি।

আমলারা চ'লে গেল।

সুবর্ণ ওর চোখে-মুখে জল দেয়, আর বাতাস করে।

একটু পরেই গায়ত্রী চোখ মেলে চাইলে, কিন্তু তখনই ক্লান্ত ভাবে আবার চোখ বন্ধ করলে।

—একটু জল খাবি গায়ত্রী?

গায়ত্রী ঘাড় নেড়ে জানালে, খাবে।

জলটুকু খেয়ে সে উঠে বসলো। লোক-সমাগম দেখে কিছুক্ষণ বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলো। তারপর ফ্যালার মায়ের অস্ফুট গুঞ্জনে ব্যাপারটা খানিকটা আন্দাজ করলে, এবং তাড়াতাড়ি হাতাটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

বাধা দিয়ে স্বর্ণ বললে, তুই শুগে যা গায়ত্রী। আমিই রাঁধছি।

লজ্জিত ব্যস্ততায় গায়ত্রী বললে, না, না, বৌদি। আমি বেশ রাঁধতে পারব। আপনি যান।

স্বর্ণ নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ওর রান্না করা দেখতে লাগলো। জিজ্ঞাসা করলে, আর কখনও তোর ফিট হয়েছে ?

—না।

—এই প্রথম ?

—হুঁ। হঠাৎ কি রকম মাথাটা ঘুরে গেল। তারপর কি হ'ল আর মনে পড়ে না।

—কেন এমন হ'ল ?

—তা জানি না।

সবাই চ'লে গিয়েছিল, কেবল ফ্যালার মা দাঁড়িয়ে ছিল। খনখন ক'রে বললে, তুমি জানবে কি গো। তাহলে শোন বলি বৌমা,

স্বর্ণ এক ধমক দিলে :

—তুই থাম তো ফ্যালার মা। আমি বুঝতে পারছি কি করে কি হ'ল, তোর গল্প শুনতে শুনতেই ওর ফিট হয়েছিল।

গালে হাত দিয়ে ফ্যালার মা চেঁচিয়ে উঠল : হেই মা! আমার গল্প শুনতে···

—আবার চেঁচাচ্ছিস। আমি জানি না ? তোর গল্প শুনতে শুনতে আমারই কতদিন ফিটের মতো হয়েছে! গল্প কিছুদিন তুই বন্ধ রাখ ফ্যালার মা।

বলে হাসতে হাসতে উপরে চলে গেল।

কাঁদ কাঁদ হয়ে ফ্যালার মা বললে, দেখো দেখি বাছা! বৌমা আমার নামে কি অপবাদ দিলেন!

গায়ত্রী হেসে বললে, তুমি বোঝ না কেন ফ্যালার মা, বৌদি ঠাট্টা ক'রে বলে গেলেন।

ফ্যালার মা কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট হ'ল না। গজগজ ক'রে বলতে লাগলো: আমার গল্প তো কেউ শোনে না। তুমিই শুধু ভালোবাসতে, তাই আসতাম। তা আর না হয় আসব না,—আর না হয় আসব না।

ব'লে মাদুরটা গুটীয়ে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। যাবার সময় বার বার ক'রে বলে গেল: বাবুর খাওয়া হয়ে গেলে যেন আমাকে ডেকো। নইলে রাত্রিতে আর খাওয়াই জুটবে না। গল্প করতে আসি কি সাধে? বসে থাকলেই ঘুমিয়ে যাই, আর ঘুমুলেই মড়া। ডেকো যেন মা, বেশ? জানো তো, ক্ষিদে আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না।

—গায়ত্রী হেসে বললে, ডাকব।

আশ্বস্ত হয়ে ফ্যালার মা শুতে গেল।

পঁচিশ

জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি মহেন্দ্র ফিরে এল।

—ক্লিনিকের খবর কি বসন্ত ?

বসন্ত হেসে বললে, ক্লিনিকের জন্যে কি বড্ড মন অসুখ করে উঠেছিল ? সেই জন্যেই বুঝি তাড়াতাড়ি ফিরে এলে ?

মহেন্দ্র হাসতে লাগলো।

বসন্ত জিজ্ঞাসা করলে, হঠাৎ ফিরে এলে যে ?

—ভেবে-চিন্তে তো যাইনি বসন্ত যে, ভেবে-চিন্তে ফিরব ? কিন্তু পেশোয়ার যাওয়া আর হল না।

—কেন ?

—ভয়ানক গরম।

—গরমের মুখেই তো তুমি বেরিয়েছিলে মহিন।

মহেন্দ্র একটা হাই তুলে বললে, সে গরম নয় হে, রাজনীতির গরম। লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' হুমকি ও-দিকটা গরম করে রেখেছে। ভয় হ'ল আর এগুতে।

বসন্ত হেসে বললে, ভয় যদি কোথাও থাকে তাহলে এই বাংলা দেশেই। তুমি যেদিকে ছিলে সেদিকে নয়,—বাদশা খাঁর পেশোয়ারে তো নয়ই।

—তাই নাকি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তা হোক গে। এবার স্থির করেছি, আর মিথ্যে ঘোরাঘুরি নয়, ক্লিনিকটা নিয়েই থাকব।

—শুনে খুশি হলাম। উপার্জনে তোমার মতি হোক।

মহেন্দ্র হেসে বললে, হবে হে হবে।

তারপর পেনিলোপীর দিকে চেয়ে বললে, আমি কেন ফিরলাম তার সত্যি কারণটা যদি শুনতে চাও তো বলি, পেনিলোপীর হাতের প্রণ কাটলেট খাবার জন্যে।

পেনিলোপী গম্ভীরভাবে বললে, So kind of you.

উদ্বিগ্ন সন্দেহে মহেন্দ্র বসন্তকে জিজ্ঞাসা করলে, পেনিলোপী যেন চটেছে মনে হচ্ছে বসন্ত ?

বসন্ত বললে, চটা বিচিত্র নয়।

—সর্বনাশ ! ও-ও কি 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' ঘোষণা করবে নাকি ? তাহ'লেই গেছি !

ওর আসার সংবাদ পেয়ে পেনিলোপী যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

ওর যাওয়ার দিকে চেয়ে থেকে মহেন্দ্র সভয়ে বললে, ব্যাপারটা তো ভালো বলে মনে হচ্ছে না বসন্ত।

বসন্ত ওকে এতটুকুও প্রশ্রয় দিলে না। বললে, নয়ই তো। তুমি একখানা চিঠি পর্যন্ত দাওনি। মনে আছে ?

—তাই নাকি ? না, না। একখানাও চিঠি দোব না, এমন হতেই পারে না।

—বসন্ত বিরক্ত দৃষ্টিতে-ওর দিকে চেয়ে বললে, একখানি মাত্র দিয়েছিলে, কাশী থেকে। তারপর আর দাওনি।

—সর্বনাশ ! এ তো আমার একবারও খেয়াল হয়নি। কিন্তু তুমি যেন আমাকে ত্যাগ কোরো না বসন্ত। তাহ'লে আমি একেবারে 'মগ্ন পঙ্কে সুহৃত্তরে'। চলো আমার সঙ্গে পেনিলোপীর কাছে। তার রাগ ভাঙানো দরকার।

কিন্তু ওকে আর উঠতে হ'ল না। পেনিলোপী তখনই ফিরে এল। পিছনে একটা বেয়ারা। তার হাতের ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম। একটা প্লেটে কিছু সিঙারা, সন্দেশ।

ট্রে'টা তার হাত থেকে নিয়ে টেবিলে রেখে পেনিলোপী জিজ্ঞাসা করলে, তোমার কি বিকেলে স্নান করার অভ্যাস আছে?

মহেন্দ্র সবিনয়ে বললে, আগে কি অভ্যাস ছিল কিছু মনে করতে পারছি না পেনিলোপী। যদি বল স্নানের অভ্যাসটা নতুন ক'রে আরম্ভ করা যেতে পারে।

পেনিলোপী তথাপি হাসলে না।

খাবারের প্লেটটা মহেন্দ্রের দিকে এগিয়ে দিয়ে সে চা তৈরি করতে করতে বেয়ারাকে বললে, সাহেবের গোসলখানায় পানি দাও।

স্নান ক'রে মহেন্দ্র যখন তার বসবার ঘরে ফিরলো, তখন ট্রেনের ক্লান্তি কেটে শরীরটা অনেকটা সুস্থ হয়েছে। দেখে, বসন্ত নেই কিন্তু পেনিলোপী কর্টা এবোনা হাতে ক'রে নিঃশব্দে ব'সে রয়েছে, বোধ করি তারই প্রতীক্ষায়।

সভয়ে একবার তার দিকে চেয়ে মহেন্দ্র অদূরে একটা শোফার হাতলে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে শুলো।

পেনিলোপী কোনো কথাই বললে না। যেমন নিঃশব্দে সেলাই করছিল তেমনি নিঃশব্দে শেলাই ক'রে যেতে লাগলো।

মহেন্দ্র তাতে আরও ভয় পেয়ে গেল। পেনিলোপীকে তোয়াজ করবার জন্যে বললে, তোমার এই গুণটি দেখে আসছি পেনিলোপী, তুমি অলসভাবে খনও ব'সে থাক না।

পেনিলোপী তথাপি সাড়া দিলে না।

মহেন্দ্রও আর কিছু বলতে সাহস করলে না। একবার মনে হ'ল, কাউকে খবরের কাগজখানা আনতে বলে। আজকের কাগজ তার পড়াই হয়নি। কিন্তু কথা বলতেই সাহস হ'ল না। অর্ধশায়িত অবস্থায় পা দোলাতে লাগলো।

ছু'জনেই নীরব।

হঠাৎ শেলাইটা একপাশে সরিয়ে রেখে পেনিলোপী জিজ্ঞাসা করলে, গায়ত্রী মরে এই কি তোমার ইচ্ছে?

সর্বনাশ! একি প্রশ্ন।

মহেন্দ্র বললে, এরকম ইচ্ছে আমার আছে ব'লে তো স্মরণ হচ্ছে না পেনিলোপী।

—কিন্তু তাই তো মনে হচ্ছে। তার অবস্থা জানো?

—কি ক'রে জানব?

—কেউ কিছু লেখেনি?

—কে লিখবে?

সত্যই তো কেই বা লিখবে? ফিট হচ্ছে, অমন কত মেয়েরই তো হয়। কিন্তু কেউ তো জানে না কেন ফিট হচ্ছে।

পেনিলোপী বললে, রোজ ছু'তিন বার ক'রে তার ফিট হচ্ছে।

—আমি তার কি করতে পারি বলো। হিষ্টিরিয়া তো সামান্য ব্যাপার, তার এ্যাপোপ্লেক্সি হ'লে এ্যাপোপ্লেক্সি সারাতেও সে আমার কাছে আসবে না, সে তো তুমি জানো।

—তিক্ত কণ্ঠে পেনিলোপী বললে, জানি। কিন্তু তার ফিট কেন হচ্ছে তাও তো অনুমান করতে পারো।

—না। কিছুই অনুমান করতে পারি না।

—তোমার জন্যেই হয়েছে এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তোমার হঠাৎ চলে যাওয়াটা, আমার মনে হয়, সে সহ্য করতে পারলে না। তার থেকেই এই ব্যাধির সৃষ্টি।

—তাহলে আমাকে কি করতে বলো? এর পর কোথাও যেতে-আসতে গেলে তার অনুমতি নিতে হবে?

যথাসাধ্য সংযতকণ্ঠেই মহেন্দ্র কথা ক'টি বললে। কিন্তু তাতেও

তার মনের বিরক্তি এবং অসহিষ্ণুতা পেনিলোপীর নিকট গোপন রইলো না।

প্রদীপ্ত চোখে মহেন্দ্রের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে পেনিলোপী ধীরে ধীরে বললে, তুমি যে এত অমানুষ হয়ে গেছ তা ভাবিনি মহিন! গায়ত্রীর উপর কি তোমার কোনো কর্তব্য নেই?

—না, কিছুমাত্র না।

গুলি-খাওয়া বাঘের মতো মহেন্দ্র লাফিয়ে সোফার উপর উঠে বসলো। বললে, সংসারে আমিই শুধু সকলের উপর কর্তব্য ক'রে যাব পেনিলোপী? আর আমার বুক যে পুড়ে যাচ্ছে, মাথায় আগুন জ্বলছে, কোথাও এক মিনিট সুস্থ হয়ে বসতে পারছি না,—আমার উপর কি কারও কোনো কর্তব্য নেই? সব কর্তব্য কি শুধু আমিই ক'রে যাব, বলতে চাও?

মহেন্দ্রের জ্বলন্ত চোখ দুটোর দিকে চেয়ে পেনিলোপী ভয়ে এবং বিস্ময়ে থমকে গেল।

মহেন্দ্র বলতে লাগলো:

—ও যে কী নিষ্ঠুর মেয়ে মানুষ, তার কিছু ধারণা তোমারও তো আছে। আমি জানি, আমার উপর রাগ করার ওর কারণ আছে। ওকে একদিন অসহায় ফেলে রেখে আমি যুদ্ধে পালিয়েছিলাম। না যদি পালাতাম, সাহসের সঙ্গে যদি ওকে গ্রহণ করতে পারতাম, তাহ'লে ঘটনার স্রোত আজ অন্য দিকে বইতো। কিন্তু তখন বাবা বর্তমান, আমারও বয়স কম ছিল। সেই বয়সের দুর্বলতা এমন কিছু অমার্জনীয় অপরাধ নয় তবু স্বীকার ক'রে নিলাম আমি অপরাধী। আমার অপরাধের সীমা নেই. কিন্তু গোলক কি অপরাধ করেছে? তাকে কেন এমন ক'রে কষ্ট দিচ্ছে ও?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মহেন্দ্র পেনিলোপী মুখের দিকে চাইলে। পেনিলোপী কোনো উত্তর দিলে না।

মহেন্দ্রের কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে কোমল হয়ে আসছিল। বললে, ক'লকাতায় আসবার আগের দিন আমি গোলকের বাড়ী গিয়েছিলাম। সে যে কত দরিদ্র এবং কত দুঃখী তুমি ধারণা করতে পারবে না। এই দুর্দিনে ওর জন্যে ওই কাপড়খানি কিনতে তাকে কতদিন যে উপবাস করতে হয়েছে এবং কত দুঃখ স্বীকার করতে হয়েছে সে আমি নিজেও ধারণা করতে পারি না। সেই কাপড় যে ফিরিয়ে দিতে পারে, তার অসাধ্য কি কিছু আছে ব'লে মনে কর?

পেনিলোপী এরও কোনো জবাব দিতে পারলে না।

মহেন্দ্র সোফার পিঠে আরাম ক'রে ঠেস দিয়ে বললে, না পেনিলোপী, এ ব্যাপারে আমার আর কিছুমাত্র কর্তব্য নেই। আমি হাত ধুয়ে ফেলেছি। বাকি জীবনটা আমাকে নিশ্চিন্তে কাটাতে দাও।

ছাব্বিশ

মহেন্দ্র ক্লিনিকের কাজে একেবারে ডুবে গেল। রেশন এবং আরও নানা ব্যবস্থার কল্যাণে শহরে রোগের অন্ত নেই। সুতরাং কেস্ কিছু কিছু থাকেই। এর উপর মহেন্দ্র এবং বসন্ত জানা-শোনা বড় বড় ডাক্তারদের কাছেও ধর্ণা দেয়, কিছু কিছু কেস তাদের ক্লিনিকে পাঠাবার জন্যে। পাঠানও তাঁরাও কিছু।

দুজনের প্রাণপাত পরিশ্রমে মাস দুয়েকের মধ্যেই ক্লিনিকটা দাঁড়িয়ে যাবার অবস্থায় এল। কাজকর্ম বেশ চলতে লাগলো।

ইতিমধ্যে ১৬ই আগষ্ট।

সূর্য ওঠার আগে থেকেই হাঙ্গামা সুরু হয়ে গেল। বারোটার মধ্যে আর বাইরে বেরুবার অবস্থা রইলো না।

বসন্ত বললে, কী কাণ্ড আরম্ভ হ'ল হে! কদ্দিন এমনি চলবে কে জানে!

মহেন্দ্রের মুখখানা কঠিন হয়ে উঠলো। শুধু বললে, তাইতো!

অবস্থা দেখতে দেখতে আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। লুঠতরাজ, অগ্নিদাহ, নরহত্যা, নারীহরণ, দলবদ্ধ আক্রমণ কিছুই আর বাকি রইলো না। মনে হ'ল, কত সহস্র বৎসরের সভ্যতা মুহূর্তের মধ্যে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বাংলা দেশের মানুষ আবার সেই আদিম বর্বর যুগে ফিরে গেছে। 'জয়হিন্দ' 'বন্দে মাতরম' আর 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনিতে স্তব্ধ রাত্রি থেকে থেকে উচ্চকিত হয়ে ওঠে। রাইফেলের গুলি চলে, বোমা ফাটে, রাজপথে মৃতদেহের স্তূপ জমে। শকুনি নামে শহরে বুকের উপর।

ট্রাম-বাস, ট্যাক্সি-রিক্সা সমস্ত যানবাহন বন্ধ। রাজপথ জনহীন। কে বেরুবে? গলির মোড়ে-মোড়ে আততায়ী ছুরি নিয়ে লুকিয়ে রয়েছে। শুধু অসহায় আশ্রয়প্রার্থীর দল কচি-কাচা, মেয়ে-ছেলে, বোচকা-বুঁচকি নিয়ে মুষিকের মত এক গলি থেকে আর গলি দিয়ে পথ চলেছে দ্রুত ত্রস্ততায়। তাদেরই অবারিত জনস্রোত মুমূর্ষু কলিকাতাকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চঞ্চল ক'রে রেখেছে।

মৃত্যুর সে কী বীভৎস শোচনীয় রূপ!

মানুষের জীবন কীটের চেয়েও তুচ্ছ হয়ে গেল। প্রাণ-নেওয়া যেন নিতান্ত সহজ ব্যাপারে পরিণত হ'ল। স্কুলের ছেলে খেলতে গেল, আর ফিরলো না। যে আপিসে বেরুলো দুপুরে, আর সে ফিরে এল না। লক্ষপতি সমস্ত ফেলে একবস্ত্রে পরিবারবর্গ নিয়ে পালিয়ে গেল। কেউ বা তাও পারলে না, সেইখানেই সবংশে নিহত হ'ল। কত লক্ষ লক্ষ টাকার দোকান লুঠ হ'ল। কত গৃহস্থ সর্বস্বান্ত হ'ল, কত নারী বিধবা, পুত্রহারা এবং কত ছেলে পিতৃমাতৃহারা অনাথ হ'ল তার আর সীমা-সংখ্যা রইল না।

ক'লকাতায় গুণ্ডার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

বসন্ত বললে, পেনিলোপী তুমি মেমসাহেব, তোমার সাত খুন মাপ। কেউ তোমার গায়ে হাত দেবে না। বের কর তোমার পুরোণো মেমের পোশাক। আমাদেরও আছে সামরিক পোশাক। গাড়ীখানা নিয়ে একবার ঘুরে আসি। যাবে মহিন ?

—চল।

রাস্তার মোড়ে-মোড়ে তখন পুলিশ এবং মিলিটারী পিকেট বসেছে। মাঝে মাঝে হু হু শব্দে বেরিয়ে যাচ্ছে মিলিটারী ট্রাক। তাদের হাতের সঙ্গীনওয়ালা বন্দুক উঁচানোই রয়েছে।

ওদের গাড়ী বড় রাস্তায় একটু যেতেই পেনিলোপী নাকে রুমাল চেপে ধরলে। বললে, এত দুর্গন্ধ কিসের ?

গাড়ী চালাচ্ছিল বসন্ত। বললে, দেখতে পাচ্ছ না ?

পেনিলোপী দেখলে, রাস্তার দুধারে আবর্জনার স্তূপ জমেছে। মেথররা ভয়ে বেরুতে সাহস করছে না। জঞ্জাল পরিষ্কার হচ্ছে না। যে যার বাড়ীর জঞ্জাল বড় রাস্তায় ফেলে দিয়ে যাচ্ছে।

সামনে একটা কাপড়ের দোকান তখনও ধোঁয়াচ্ছে। এইখানে পেনিলোপী কাপড় কিনতে আসতো। দরজাগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কোলাপ্‌সিব্‌ল্ গেট তোবড়ানো। ভিতরের এবং বাহিরের দেওয়ালগুলো পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে। জিনিসপত্র কিছু নেই, সমস্ত লুণ্ঠিত।

পেনিলোপী বললে, দেখ, দেখ, দোকানটার অবস্থা! কয়েক লক্ষ টাকার জিনিস এখানে ছিল। ইন্দ্রপুরীর মতো সাজানো দোকান, কী হয়ে গেছে দেখ।

—আরে, এ পার্কের রেলিং কি হ'ল ?

—লোহার ডাণ্ডাগুলো দিয়ে দাঙ্গা করেছে বোধ হয়।

—সম্ভব।

হঠাৎ মহেন্দ্র বললে, ওই দেখ।

গাড়ীর গতি মন্দীভূত ক'রে ওরা চমকে চাইলে :

প্রকাণ্ড একটা লাস। ফুলে ঢোল হয়েছে। মাথাটা তার জঞ্জালের মধ্যে গোঁজা। উবু হয়ে প'ড়ে। উন্মুক্ত পিঠের খানিকটা দু'ফাঁক হয়ে হাঁ করে রয়েছে। রক্তাক্ত মাংস বেরিয়ে পড়েছে! সম্পূর্ণ উলঙ্গ। একটা কাক তার কোমরের পাশে ঠুকরে ফুটো ক'রে নাড়িভুঁড়িগুলো বের ক'রে পরমানন্দে চীৎকার ক'রে অন্য কাকগুলোকে ডাকছে।

পেনিলোপী চীৎকার ক'রে উঠলো :

—ফেরো ফেরো বসন্ত। এ নরক আর দেখা যায় না। ঈশ্বরের দোহাই; ফেরো ফেরো।

দেখা যায় না সত্যই।

মহেন্দ্র এবং বসন্তর মুখ একটা নিষ্ঠুর ক্রূরতায় শক্ত হয়ে উঠেছে। বসন্ত বাড়ীর দিকে গাড়ী ফেরালে।

সান্ধ্য আইন আর ১৪৪ ধারার রাজত্ব।

দাঙ্গার প্রচণ্ডতা স্তিমিত হয়ে এসেছে। কিন্তু মানুষের মনে আস্থা ফিরে আসেনি এখনও। ট্রাম-বাস চলেছে মিলিটারী পাহারায়। তাও সব রাস্তায় নয়। কোনো কোনো রাস্তায় এসিড ছোঁড়ার খবরও পাওয়া যাচ্ছে। ইতস্ততঃ গুপ্ত ছুরিকাও চলেছে। এখনও লোকে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারছে না। পাড়ার ছেলেরা সতর্কভাবে পাহারা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে উঠছে 'জয় হিন্দ', 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি। লোকে ত্রস্তভাবে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ছে। কোথায় কি হচ্ছে, অথবা আদৌ কিছু হচ্ছে কি না, বোঝাবার উপায় নেই। ধ্বনি তরঙ্গের পর তরঙ্গে শহরের

একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। বাইরে বারান্দায় দাঁড়াবার উপায় নেই, মিলিটারী গুলী চালাচ্ছে এলোপাথারী। ঝড়ের মতো, সমুদ্র গর্জনের মতো শব্দ ক'রে ট্যাঙ্ক বেড়াচ্ছে টহল দিয়ে।

দিনে অপেক্ষাকৃত শান্ত অবস্থা।

বিপজ্জনক এলাকায় মূল বাজার থেকে নিরাপদ দূরত্বে গলির ভিতর দু'পাশে বসেছে বাজার। দোকান-পাটও ধীরে ধীরে খুলছে। লোকে, যদিচ ভয়ে ভয়েই, তবু বাজার-হাট, আফিস-কাছারী, কাজ-কর্ম ক'রছে। ধীরে ধীরে শহরে জীবনের লক্ষণ ফিরে আসার আশা হচ্ছে। অবশ্য আশা অতি ক্ষীণ। কারণ নাগরিক জীবন যে রকম আমূল বিপর্যস্ত হয়েছে তাতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে অনেক দেরি।

এই রকম অবস্থায় হঠাৎ এক দুঃসংবাদে মহেন্দ্র যেন বজ্রাহত হয়ে গেল:

তাদের শ্রীপুর এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও ভীষণ হাঙ্গামার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল। প্রকাশিত বিবরণের কিয়দংশ সত্য হ'লেও ব্যাপার গুরুতর। ওই অঞ্চলটি বরাবর মুসলমানপ্রধান। বাইরের লোক এসে কিছুদিন থেকেই তাদের উত্তেজিত করছিল। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার পরে প্রায় পাঁচ হাজার লোকের এক জনতা একখানি গ্রাম আক্রমণ করে। অপ্রস্তুত এবং সংখ্যাল্প হিন্দুরা কতক পালিয়ে যায়, কতক বা হতাহত হয়। সারারাত্রি মশালের আলোয় হিন্দুদের বাড়ী লুঠ হয়। আক্রমণকারীদের হাতে বন্দুক থেকে আরম্ভ ক'রে নানারকম অস্ত্র ছিল।

পরদিন সকালে সেই জনতা কুচকাওয়াজ ক'রে একটির পর একটি গ্রাম আক্রমণ করতে আরম্ভ করে। ইচ্ছা করলে, নরেন মোটরে ক'রে সপরিবারে পালিয়ে যেতে পারত। ইব্রাহিম পূর্বাহ্ণেই গোপনে তাকে সংবাদ দিয়েছিল এবং পালিয়ে যাবার জন্যে সাধ্যসাধনাও করেছিল। তখন অবশ্য সময় বেশি ছিল না। আক্রমণকারীদের ব্যাণ্ডের বাজনা এবং উদ্দাম উল্লাসধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।

নরেন স্থির করলে, পালিয়ে যাওয়ার মানে হয় না। আক্রমণকারীদের বাধা দেওয়া ছাড়া কোন সম্মানজনক পথ নেই।. গ্রামের সমস্ত হিন্দু নরনারীকে সে নিজের অট্টালিকায় নিয়ে এল। অন্দরে পাঠিয়ে দিলে মেয়েদের এবং পুরুষদের নিয়ে নিজে সে সদরে বন্দুক হাতে ক'রে আক্রমণকারীদের প্রতীক্ষা ক'রে রইল।

সেই অল্প লোক নিয়েই সেদিনটা সে আক্রমণ প্রতিহত করলে। তারপর বন্দুকের গুলী গেল ফুরিয়ে। পরের দিন আবার যখন আক্রমণ আরম্ভ হ'ল তখন লাঠি হাতেই যতখানি পারলে বাধা দিলে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ সম্ভব? নরেন এবং আরও কয়েকজন নিহত এবং অবশিষ্ট আহত হ'ল।

যারা বেঁচে রইলো, তারা ধর্মের বিনিময়ে বেঁচে রইল। খবরে কাগজে প্রকাশ, জোর ক'রে তাদের মুসলমান করা হয়েছে। সধবা-বিধবা-কুমারী নির্বিশেষে স্ত্রীলোকদেরও মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত ক'রে স্থানীয় মুসলমানদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়েছে।

এই বিবরণ পড়তে পড়তে মহেন্দ্রের রক্ত মাথায় চড়লো।

বললে, আমাকে এখনই যেতে হবে বসন্ত। আমি চললাম। যদি না ফিরি…

বসন্ত বললে, বিলক্ষণ! আমি শুদ্ধ যাব যে। রিভলবারটা নিয়ে আসি। তোমারও একটা আছে না?

মহেন্দ্র হেসে বললে, দুটো রিভলবারে দশ হাজার লোকের জনতা তুমি কতক্ষণ ঠেকাবে বসন্ত?

—যতক্ষণ পারি। তবু সঙ্গে থাকা ভালো।

পেনিলোপী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে, আর তোমাদের ছেড়ে দিয়ে আমি এখানে আহারনিদ্রা বন্ধ করে জীবন্মৃত হয়ে থাকি! কেমন? সে হবে না। আমি শুদ্ধ সঙ্গে যাব।

বসন্ত আর মহেন্দ্র এক সঙ্গে বলে উঠলো : তুমি যাবে কী!

—যেতেই হবে। উপায় কি বল?—ওদের দুজনের সমস্ত আপত্তি যেন দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে পেনিলোপী ব'লে চললো,—আমি বলি কি, তোমাদের জেলার শহর পর্যন্ত তো মোটর যায়। ট্রেনের উপর এখন নির্ভর করা চলে না। সুতরাং ততদূর অবধি মোটরে যাব। সেখানে মিঃ জনসনের সঙ্গে আলোচনা করব। তারপর সম্ভব হলে মোটরে, নয়তো যাতে-করে-হোক শ্রীপুর যাব। সেই ভালো হবে না?

প্রস্তাবটির সমীচীনতা ওরা উপলব্ধি করলে। মোটরে যাওয়াই ভালো। বিশেষ, ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করে যাওয়া দরকার। পুলিস এবং মিলিটারী সাহায্যের আবশ্যক হতে পারে। খুব সম্ভব, জায়গাটা এখন একেবারেই অরাজক হয়ে আছে। একলা যাওয়া নিরাপদ তো নয়ই, নিরর্থকও।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সামান্য কিছু জামা-কাপড় এবং কিছু টাকা নিয়ে ওরা তিনজনে রওনা হয়ে পড়লো। পেনিলোপীকে নিবৃত্ত করা কিছুতেই সম্ভব হোল না।

ওদের মোটর যখন ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলোয় গিয়ে পৌছলো তখন সন্ধ্যা হয়েছে। ওদের দেখে মিসেস জনসন নিজেই বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা ক'রে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

বিষণ্ণ বদনে জিজ্ঞাসা করলেন, সবই শুনেছেন বোধ হয়?

ঘাড় নেড়ে পেনিলোপী বললে, খবরের কাগজে যেটুকু বেরিয়েছে, পড়েছি।

মিসেস জনসন বললেন, ভারি শোচনীয় ঘটনা। টেলিগ্রাফের তার কেটে, থানা ঘেরাও ক'রে রেখে এমন কাণ্ড ক'রেছিল যে, তিন দিনের

আগে আমরাও খবর পাইনি। খবর পাওয়ামাত্র পুলিশ সাহেব এবং একদল সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে চার্লি তখনই মোটরে বেরিয়ে গেছে। সৈন্য এসে পৌঁছয় পরের দিন এবং তখনই ট্রাকে ক'রে শ্রীপুর রওনা হয়ে যায়। আপনারা কি করবেন মনে করেছেন ?

মহেন্দ্র বললে, আমরাও এখনই মোটরে রওনা হব।

চিন্তিতভাবে মিসেস জনসন বললেন, সেটা নিরাপদ হবে না। মোটর তো সবটা যাবে না। বাদশাহী সড়ক পর্যন্ত যাবে। সেখানে পৌঁছুতে আপনাদের রাত্রি হয়ে যাবে। তারপর সেইখানে মোটর রেখে হাঁটতে হবে। স্থানটা এখন খুবই বিপজ্জনক।

—কিন্তু আমাদের উপায় কি বলুন ? যত বিপজ্জনকই হোক, আমাদের তো যেতেই হবে।

—সে ঠিক। তাহ'লে একটা কাজ করুন। এখন আর যাবেন না। শেষ রাত্রে বেরুবেন, ঠিক সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যাবেন। আমি যতদূর খবর পেয়েছি, আপনাদের সেই বাগানবাড়ীতেই সরকারী ক্যাম্প ব'সেছে। মিসেস লাহিড়ি, আপনি নিশ্চয় যাচ্ছেন না ?

—যাব ব'লেই তো বেরিয়েছি।

—আপনিও যাচ্ছেন ?—মিসেস জনসন কি যেন,চিন্তা ক'রে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন,—তাহ'লে শেষ রাত্রে যাওয়াই স্থির করলেন তো ? আমার মনে হয়, সেইটেই ভালো হবে।

মহেন্দ্র একটুক্ষণ কি যেন চিন্তা করলে। তারপর বললে, বেশ তো। শেষ রাত্রেই বেরুনো যাবে বরং। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধান বই তো নয়।

মিসেস জনসন সানুনয়ে বললেন, তাহ'লে আমাকেও অনুগ্রহ ক'রে সঙ্গে নেবেন ? বহু স্ত্রীলোক বিপন্ন শুনছি। আমার মনে হয়, আমারও সেখানে করবার আছে।

—বেশ, তো, চলুন না। আপনি গেলে তো খুবই ভালো হয়।—মহেন্দ্র সাগ্রহে বললে।

—মিসেস লাহিড়িকে দেখে সাহস হচ্ছে। তাই চলুন, আমিও যাই। থানায় খবর পাঠাচ্ছি একজন সশস্ত্র সিপাহী দেবার জন্যে। আপনার গাড়ী তো বড়। কুলোবে না?

—খুব কুলোবে।

থানায় খবর পাঠাবার জন্যে মিসেস জনসন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই যখন তিনি ফিরলেন, তাঁর পিছনে একটা বেয়ারা চায়ের ট্রে নিয়ে এল।

মিসেস জনসন বললেন, মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সমস্ত দিন আপনাদের খাওয়া হয় নি। কিছু খেয়ে নিন্ বরং।

মিসেস জনসন ঠিকই লক্ষ্য করেছিলেন। সমস্ত দিন সত্যই ওদের খাওয়া হয়নি। কিন্তু সেকথা তাদের এতক্ষণ মনেই পড়েনি। সামনে খাবার দেখে ক্ষুধার উদ্রেক হ'ল।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, আমাদের বাড়ীর মেয়েদের খবর জানেন কিছু? বেঁচে আছেন, না মুসলমান হয়েছেন?

একটু চিন্তা ক'রে মিসেস জনসন বললেন, জানিনে মেজর মুখার্জি। কিন্তু সেজন্যে চিন্তা ক'রে লাভ কি? কাল গিয়ে নিজেই তো সব দেখতে পাবেন।

—মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে আছে মিসেস জনসন।

—আমি ঠিক জানিনে মেজর মুখার্জি। অন্ততঃ মারা যাওয়ার খবর পাইনি। যাই হোক কাল আমাদের যাওয়া ঠিক রইলো।

মহেন্দ্র বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা এখন আমাদের উকিলের বাড়ী যাব একবার। রাত্রিটা সেইখানেই কাটাব। শেষরাত্রে এসে আপনাকে ডেকে নিয়ে যাব। কেমন?

বড় বাঁকের মোড়ে গিয়ে যখন ওদের মোটর পৌঁছুলো তখনও সূর্য ওঠেনি। একজন পুলিসের সাব-ইন্সপেক্টরের অধীনে সেখানে জনকয়েক সশস্ত্র সিপাহী পাহারা রয়েছে। এত ভোরে গাড়ী আসতে দেখে তারা গাড়ীখানা আটকালে।

গাড়ীর ভিতর থেকে পর পর দু'জন মেম সাহেবকে নেমে আসতে দেখে সাব-ইন্সপেক্টার নিজেই ছুটে এল। মিসেস জনসনকে চিনতে তার বিলম্ব হ'ল না। সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারী কায়দায় স্যালিউট করলে।

সেইখানেই মোটর ছেড়ে দিতে হবে। এইখান থেকে আর একটা কাঁচা সড়ক বেরিয়ে গেছে। সেইটে দিয়ে মাইল খানেক গেলেই ওদের শ্রীপুর।

মিসেস জনসন প্রত্যভিবাদন ক'রে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, গাড়ীখানা কোথায় রাখা যায়?

সাব-ইন্সপেক্টার জানালে, গাড়ী রাখবার জায়গা আছে। ওইখানে অনেকখানি জায়গা প'ড়ে আছে। তার খানিকটায় পুলিশ আর মিলিটারীর জন্যে তাঁবু খাটানো হয়েছে। আর পাশেই আর একটা তাঁবু খাটানো হয়েছে, সেখানে মোটর রাখা হয়। লোকটি আশ্বাস দিলে, এ মোটরও সেইখানেই চমৎকার রাখা যাবে। বৃষ্টির ছাঁটের জন্য কিছু অসুবিধা হবে না।

গাড়ী রাখার বন্দোবস্ত ক'রে সশস্ত্র পাহারাওয়ালাকে নিয়ে ওরা চারজন তখন হাঁটতে আরম্ভ করলে।

কী রাস্তা!

কোথাও জল, কোথাও কাদা। সেই কাদায় কোথাও কোথাও হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়। তাই ভেঙেই ওরা বহু কষ্টে চ'লে ঘণ্টা দেড়েক পরে বাগানবাড়ীতে গিয়ে পৌঁছুলো।

ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ সাহেব তখন বেরিয়ে গেছেন। আর্দালীটা জানালে, একটার আগে তাঁরা ফিরবেন না!

ওরা বাগানবাড়ীটা দেখতে লাগলো। শুধু অগ্নিদগ্ধ দেওয়াল কয়টাই দাঁড়িয়ে আছে। কড়িবরগা ঝুলে পড়েছে, ছাদও ধ্বসে গেছে। বাগানটা পর্যন্ত যেন ঝলসে গেছে।

মহেন্দ্র কম্পিত কণ্ঠে বললে, ও বাড়ীটা দেখে আসি চলুন। কে যে কেমন আছে…

বাগানবাড়ী থেকে ওরা চললো বসতবাড়ীর দিকে।

সমস্ত পথে ওরা জনমানবের দেখা পেলে না। দুধারে শুধু ঝলসানো গাছ, পোড়া বাড়ী আর ইটের স্তূপ। চলতে চলতে কয়েকটা জায়গায় পথে রক্তের দাগও দেখতে পেলে।

ওবাড়ীর অবস্থাও বাগানবাড়ীর মতোই। দরজা-জানালা অধিকাংশই পুড়ে খসে গেছে। গৃহে আসবাবপত্রের চিহ্নমাত্র নেই। লোহার সিন্ধুক উঠানের এককোণে ভাঙ্গা পড়ে রয়েছে। ঘরে ঘরে শুধু পোড়া কাঠ আর খসা চুণ-বালির টুক্রো। দুটো একটা লোহার ডাণ্ডাও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। আঘাতে-আঘাতে দেওয়ালগুলো পর্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত। রান্নাঘরের উনান-গুলোও অক্ষত নেই।

বারান্দার এবং সিঁড়ির রেলিংগুলো ঝুলছে।

আগুনে নিচের ঘরগুলোর তত বেশি ক্ষতি করতে পারেনি। ফালার মায়ের তোষকটা পড়ে রয়েছে এককোণে। ইন্দুরে তার তুলোগুলো নিয়ে ঘরময় ছড়াছড়ি করেছে।

একটা ভাঙ্গা কলসী, এবং গোটা কয়েক কুঁজো বারান্দায় কাৎ করা।

বাড়ী জন-মানবহীন।

নিঃশব্দ।

কিন্তু মহেন্দ্রের এদিকে লক্ষ্যই নেই। সে খুঁজে বেড়াচ্ছে রক্তের দাগ।

কিছু কিছু রক্তের দাগ এখানে-ওখানে চোখে পড়ে। কিন্তু একটা জায়গায় অনেকখানি চাপ-চাপ রক্ত জমাট বেঁধে কালো হয়ে রয়েছে। পাশের ঘরে আরও বেশি রক্ত ঘরময় মাখানো।

মহেন্দ্র দেওয়ালের একটা কোণ শক্ত ক'রে ধ'রে এমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো যে সবাই ভয় পেয়ে গেল।

এক রকম টেনেই ওরা সেখান থেকে মহেন্দ্রকে বাইরে নিয়ে এল।

ভাঙা ফটকটা পার হয়ে রাস্তায় নামছে এমন সময় দেখে, গোলক আসছে টলতে টলতে। পরণে একটা নতুন লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি, মাথায় কাপড়ের টুপি। এমন চেহারা হয়েছে যে, ওরা প্রথমটা চিনতেই পারলে না।

গোলক কিন্তু এসেই মহেন্দ্রকে গড় হয়ে প্রণাম করলে।

মহেন্দ্র সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, কে, গোলক?

ভক্তিভরে মহেন্দ্রের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে গোলক বললে, আজ্ঞে না, আমি আব্বাস।

উঠে দাঁড়াতেই গোলকের মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ ক'রে মদের গন্ধ বেরুলো। পেনিলোপী আর মিসেস জনসন নাকে রুমাল দিয়ে সরে দাঁড়ালেন।

মহেন্দ্র ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, এরা সব কোথায় গোলক দাদা? বেঁচে আছে তো?

মাতালটা হাত নেড়ে বললে, আজ্ঞে যারা মরেনি, তারা সবাই বেঁচে আছে।

উত্তরটা এমনই যে, এই ভয়ঙ্কর শ্মশানের মধ্যে দাঁড়িয়েও সশস্ত্র সিপাইটা ফিক করে হেসে ফেললে।

তা গোলকের চক্ষু এড়ালো না।

ভীষণ রেগে সে বললে, হাসো যে! হাসো যে হে বোনাই! হাসে কে? কে হাসে জানো?

সেইখানে মাটির উপর গোলক ধপ্ ক'রে ব'সে পড়লো। তারপরে ডান হাতে মাটি চাপড়ে বলতে লাগলো :

—হাসে মেদিনী, যখন মানুষ তাকে নিজের ভেবে দেমাক করে। আর হাসে অসতী মেয়েমানুষ, যখন তার স্বামী তার ছেলেকে নিজের ভেবে আদর করে। আর হাসে মহাকাল। কিন্তু সে ব্যাটা কে আমি ঠিক জানি না, বুঝলে?

ব'লে টলতে টলতে সোজা চলে গেল।

পেনিলোপী অবাক!

বললে, এত বড় কথা ওই মাতালটা বললে!

শান্তকণ্ঠে বসন্ত বললে, তুমি তো বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরোনি। এর চেয়ে কত বড় কথা কত সামান্য লোকের মুখ থেকে কত সহজে বেরোয়, শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

ওরা রাস্তা ধ'রে চলতে লাগলো। হঠাৎ দেখা গেল, নবাই মণ্ডল ওদের দেখে পাশ কাটিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। সিপাহীটাকে ইসারা করতেই সে ছুটে গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে এল।

তারও পরণে গোলকের মতোই বেশ। চোখে ভীতি-বিহ্বল চাহনি। মহেন্দ্রকে দেখেই ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললে।

বললে, আমরা সব মুসলমান হয়ে গেছি ছোট বাবু।

—কিচ্ছু হওনি তোমরা, হিন্দুই আছ।

নবাইএর চোখটা যেন আশায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো।

বললে, বলেন কি! আমরা হিন্দুই আছি! কলমা পড়েছি, অখাদ্য খেয়েছি, এর পরেও হিন্দুরা আমাদের নেবে?

—নেবে বই কি নবাই, নিশ্চয় নেবে! এখন চলো তো আমাদের সঙ্গে। কে কোথায় আছে দেখিয়ে দেবে। ভয় নেই, তোমাদের কিছু ভয় নেই। মেয়েরা কে কোথায় আছে জানো?

—সব জানি ছোট বাবু। কিন্তু ভয় নেই তো? সত্যি বলছেন?

—কিছু ভয় নেই। তুমি চলো।

বিকেলে বসন্তকে ডেকে সেদিনের খবরের কাগজের একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মহেন্দ্র বললে, দেখেছ?

বসন্ত দেখলে, বাংলার পণ্ডিত সমাজ পাঁতি দিয়েছেন, জোর করে যাদের ধর্মান্তরিত করা অথবা বিবাহ দেওয়া হয়েছে তাদের হিন্দু সমাজে ফিরিয়ে নেওয়ার কোন বাধা তো নেইই, বরং নেওয়াই কর্তব্য। বিনা প্রায়শ্চিত্তেই তাদের গ্রহণ করা হবে।

মহেন্দ্র বললে, দেখলে? আমার মনে হয় বসন্ত, যে ধাক্কা আজ হিন্দু-সমাজ পেলে তা বড় মর্মান্তিকই হোক না কেন, তারও প্রয়োজন ছিল। নইলে বিধি-নিষেধের এই জগদ্দল পাথর কিছুতেই ঠেলা যেত না। যেদিন লোকের ঘোরা-ফেরা মহকুমার, বড় জোর জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এত বাঁধন-কষণ পাঁজি-পুঁথি তখন চলতে পারতো। আজ যখন তাকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে, তখন এসব চলে না।

বসন্ত বললে, কিন্তু এত লোক ক্ষয়…

বাধা দিয়ে মহেন্দ্র বললে, লোকক্ষয়ের কথা আমি এখন ভাবছিই না বসন্ত। দুর্ভিক্ষে কত লোক মরেছে খবর রাখো? ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুহারের হিসাব রাখো? কিন্তু এর বিনিময়ে হিন্দু সমাজ কত বড় জীবন পাবে! ধর্মটা যে খাওয়া-ছোঁয়া, আচার-নিয়মের ঊর্ধ্বেকার একটা বস্তু, এই বোধটা জাগছে দেখছ না?

বসন্ত জিজ্ঞাসা করলে, মেয়েদের খবর কিছু পেলে?

—পেলাম।—ঊর্ধ্বে চেয়ে মহেন্দ্র শুষ্ক কণ্ঠে বলতে লাগলো,—প্রথম আক্রমণেই মা হার্ট ফেল করে মারা যান। পরের দিন দাদার মৃত্যুর খবর পেয়ে বৌদি দেন ইঁদারায় ঝাঁপ।

পেনিলোপী জিজ্ঞাসা করলে, আর গায়ত্রী ?

—ইব্রাহিমের ছেলের সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে গেছে।

ওরা স্তব্ধভাবে বসে রইলো।

ধীরে ধীরে মহেন্দ্র বলতে লাগলো :

—মিসেস জনসন তাকে আনতে গেছেন। এখনই হয় তো পড়বে তারা। আমার বিশ্বাস, তার সংস্কারে[illegible]ক খোলাটা এইবার বোধ হয় ভেঙেছে। এইবার আমার কাছে আসতে বোধ হয় বাধা হবে না তার। কিন্তু এখনই আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াব না। অকস্মাৎ সে হয় তো সইতে পারবে না। তুমি বাইরে গিয়ে বোসগে পেনিলোপী। সে একটু সুস্থ হ'লেই তাকে কানে কানে বোলো, তাকে নিয়ে যাবার জন্যই আমি এসেছি।

পেনিলোপী জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু তাকে তুমি শ্রদ্ধা করতে পারবে তো মহিন ? সত্যি ক'রে বলো ? নিজেকে ফাঁকি দিও না।

মহেন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে বললে, না। অনেক ফাঁকি নিজেকে দিয়েছি স্থির করেছি, আর ফাঁকি দেবো না। তাকে বোলো, মরা করবীর অভিশাপ এতদিনে বুঝি শেষ হ'ল। সকালে দেখে এসেছি সেই অভিশপ্ত গাছটা মূড়ে ঝলসে শুকিয়ে গেছে। আর ভয় নেই। এতদিনে বুঝি তার আমার ঘরণী হয়ে আসার সময় হল। এই সময় আমি কিছুতেই হেলায় হারাবো না। এই কথাটা বললেই সে সমস্ত বুঝবে।

জানালা দিয়ে দেখা গেল একটি দল অশ্রুমুখী নারী মিসেস জনসনের পিছু পিছু বাগানবাড়ীর ফটকে ঢুকছে।

ব্যস্তভাবে মহেন্দ্র বললে, ওই সে আসছে। তুমি যাও পেনিলোপী আর দেরী করো না। যাও।

সন্ধ্যা হয়ে আসে।

মহেন্দ্র পশ্চিম দিগন্তের দিকে চেয়ে একটা লোহার বেঞ্চিতে বসে ছিল। ধীরে ধীরে গায়ত্রী এসে তাকে প্রণাম করলে।

মহেন্দ্রের দৃষ্টি সেই রক্তাক্ত দিগন্ত থেকে ঝলসানো বাতাবী লেবুগাছে এবং সেখান থেকে ধীরে ধীরে গায়ত্রীর মুখের উপর নেমে এল :

পরণে তার সেই ছেঁড়া থান ধুতি!

কিছুক্ষণ একটি কথাও কেউ বললে না।

অনেকক্ষণ পরে মহেন্দ্র বললে, তুমি ওদের সঙ্গে কাল সকালের ট্রেণেই কলকাতা চলে যাও গায়ত্রী। আমার এখানে অনেক কাজ। যেতে কিছু দেরী হবে।

গায়ত্রী এক মুহূর্ত নিঃশব্দে নতনেত্রে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর ধীরে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার কি যেতে খুব বেশী দেরী হবে?

একটু চিন্তা করে মহেন্দ্র বললে, কিছুই বুঝতে পারছি না গায়ত্রী। তবু যত দেরিই হোক যাব নিশ্চয়ই।

শেষ